বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

প্রথম বর্ষ▪সংখ্যা - ২▪এপ্রিল ২০১১

সাম্প্রতিক

জাপানে সুনামি – সবকিছু বিধ্বস্ত করল

পরীক্ষায় টোকাটুকি ও অনৈতিকতা

রাজীব দাসের মৃত্যু – একটি ময়না তদন্ত

কুসংস্কার বিরোধী রচনা

সাপের সাত কাহন

পাঠকের পাতা

রিপোর্ট

বিজ্ঞান মনস্ক'র দুদিন ব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠান

ত্রিপুরায় ভূমিকম্প বিষয়ক সেমিনার

মূল্যায়ন

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

জৈব প্রযুক্তির মহা আবিষ্কার ঃ ক্লোনিং

বিশেষ রচনা

খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল – কুফল ও গণসচেতনতা

খাদ্য সংকট ও বেকারত্বের কারণ কি জনসংখ্যা বৃদ্ধি?

সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি

সম্পাদকীয়

মানবজীবনের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, প্রকৃতির শাসনকে নীরবে না মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। যে পথ ধরে প্রাইমেট থেকে মানুষের আবির্ভাব – সেই পথেই হাতিয়ারের ব্যবহার – হাতিয়ার ব্যবহার এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লিভার এর সুবিধা অর্জন – প্রয়োজন অনুযায়ী হাতিয়ারের উন্নতি সাধন – এ সবকিছুই সম্ভব হয়েছিল প্রকৃতি থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার সমাজবদ্ধ ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে। কিন্তু বাস্তব জীবনে, যখন অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হয়েছে, তখনই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছে কিছু মানুষ। বহু শ্রম ও জীবনের বিনিময়ে আবির্ভূত হয়েছে, "বিজ্ঞান" – যা হল কোন ঘটনার বস্তুগত কারণ।

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, কৃষির আবিষ্কার, মানুষকে সমগ্র জীবজগতের মধ্যে স্বতন্ত্র করেছিল। আদিতে কৃষির আবিষ্কার শুধুমাত্র প্রকৃতি থেকে খাদ্য আহরণের পরিবর্তে খাদ্য উৎপাদনের সূচনা করলেও সে কৃষি ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর, নিয়মিত বন্যা-খরা-মড়ক ছিল প্রকৃতির দান। তথাপি প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেই, তাকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টায় প্রাচীন কাল থেকেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছিল সেচ ব্যবস্থা – যা প্রাকৃতিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হত। কৃষির এই আবিষ্কার মানুষের যাযাবর জীবন যাপনে ছেদ টানলেও সমাজের প্রয়োজনীয় খাদ্যের তুলনায় খাদ্য উৎপাদন ছিল নগণ্য। উৎপাদন, সামাজিক চাহিদা না মটাতে পারায় সমাজ হয়ে পড়ে শ্রেণী বিভক্ত। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন হতে থাকে সম্পত্তির মালিক শ্রেণীর স্বার্থপূরণের জন্য। শুরু হয় এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ। শোষক ও শোষিত শ্রেণীর চাহিদা ও লক্ষ্য পরস্পর বিপরীত হওয়ায় শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সমাজ অর্থনীতিতে উৎপাদনের লক্ষ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত নতুন মালিক শ্রেণীর দ্বারা পুরাতন মালিক শ্রেণী ক্ষমতা চ্যুত হয়েছে, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমে পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখল এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ পূর্বের সকল উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে এক পৃথক চিত্র মানব সমাজের সামনে হাজির করে। উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক বিজ্ঞান, প্রযুক্তির আবিষ্কার ও প্রয়োগে উৎপাদনের বিকাশ এমন একটা মাত্রায় পৌছায় – যেখানে মানব জীবন প্রকৃতি নির্ভর না থেকে, প্রকৃতিকে ব্যবহার করে সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। বন্যা-ক্ষরা-মড়ক নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

জীবন (প্রজাতি) যদি প্রকৃতি নির্ভর না হয়, তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদও জীবনকে (প্রজাতিকে) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বর্তমানে উৎপাদন বিকাশর ব্যাপকতা সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হওয়ার কারণটাকে অপসারণ করতে চায়। কিন্তু উৎপাদনের লক্ষ্য এর পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যই উৎপাদিত পণ্যের সুষম বন্টনে বাধা দান করছে। যার ফলে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সুফলগুলি, ক্রয়ক্ষমতাহীন বেশীরভাগ মানুষের কাছে পৌছাতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ অনুযায়ী সমস্যার কারণ নির্ণয় ও অপসারণের মাধ্যমে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তাই সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিকভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সংস্কারের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব নয়। কারণ সমস্যাকে টিঁকিয়ে রেখে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

তাই প্রতিটি ঘটনার পিছনের কারণ অনুসন্ধান করা, বস্তুর বিকাশের বাধাগুলি চিহ্নিত করে তাকে অপসারণ করা একটি সামাজিক দায়িত্ব। সমাজ সচেতন, বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ গড়ে তোলার এক অতি ক্ষুদ্র প্রয়াস হল সমীক্ষণ। প্রথম সংখ্যা নিমেষে নিঃশেষিত হওয়ার ঘটনা আমাদের উৎসাহিত করেছে। দূর দূরান্ত থেকে পাঠকরা যোগাযোগ করেছেন, নানা রচনা, কবিতা ও তাদের অনুভূতির দ্বারা আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে সমীক্ষণের পথচলা শুরু হয়েছে, লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এগিয়ে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ■

ভুল সংশোধন

* প্রথম সংখ্যায় প্রচ্ছদ থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় ছাপার ভুল ধরা পড়েছে। প্রথম সংখ্যা জানুয়ারী ২০১১ এর বদলে ডিসেম্বর ২০১০ লেখা হয়েছে। অভিজ্ঞতার অভাবে এত অনিচ্ছকৃত ভুল হয়েছে। এর জন্য সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আগামী দিনে এ বিষয়ে যত্নবান হওয়ার প্রয়াস রাখব।

* ২৩শে জানুয়ারী ২০১১, বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'ধর্ম-সমাজ প্রগতির অন্তরায় নয়' শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সঞ্জিত মন্ডল-কে প্রথম এবং সংযুক্তা চক্রবর্তীকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়। বাস্তবে সংযুক্তা চক্রবর্তী প্রথম এবং অভীক মুখার্জী দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। এই ভুলের জন্য সংগঠন সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

জাপানে সুনামি – সবকিছু বিধ্বস্ত করল

১১ই মার্চ ২০১১, জাপানের হনসু প্রদেশের সেনডাই অঞ্চলের ১৩০ কিমি পূর্বে এক বিশাল ভূমিকম্পের দরুণ এবং তার ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে যে প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের অর্থাৎ সুনামি সৃষ্টি হয় তাতে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, ঘর-সম্পদ হারিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, সুনামির তান্ডবে সে দেশের দাইচি পরমাণু চুল্লিতে বিস্ফোরণ হয়েছে এবং এই বিস্ফোরণে ব্যাপক মাত্রায় তেজস্ক্রিয় রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ বিপদের সৃষ্টি করেছে। এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জাপান সহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং সংলগ্ন অঞ্চলে এক ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

সুনামি নামটির সাথে বর্তমানে আমরা অনেকেই পরিচিত। ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৪, ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে বিশাল ভূমিকম্পের ফলে প্রবল ভূমিকম্প হয়েছিল। এই ভূমিকম্প সেসময় যে সুনামি ঘটিয়েছিল তার ফলে ভারত সহ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জাপানী ভাষায় Tsu মানে harbour বা বন্দর এবং nami মানে wave বা ঢেউ। সুনামি সার্বিক অর্থে ক্ষয়ক্ষতিকারী জলোচ্ছ্বাস বা ঢেউ, যা কিনা প্রধানভাবে সমুদ্রপাড় বা বন্দর এলাকাতেই দেখা যায়। সুনামি tidal wave বা জোয়ার নয়, ভূমিকম্প এবং অন্যান্য ভূ-আলোড়নই সুনামি-র কারণ।

সুনামি-র নির্দিষ্ট কারণ কী? ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে ৭.১ মাত্রার চেয়েও বড় মাত্রায় ভূমিকম্প, (যা সমুদ্রতলকে উপর/নীচে তুলে দেয়) সমুদ্রপাড়ের ধ্বস, সমুদ্র অভ্যন্তরের বড় মাত্রার অগ্ন্যুৎপাত, বহির্বিশ্বের কোন বস্তুর (যেমন উল্কা) সাথে সংঘাত বা সমুদ্রতলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ সুনামি'র কারণ। গত ১১ই মার্চ আন্তর্জাতিক সময় সকাল ৫টা ৪৬ মিনিট ২৩ সেকেন্ড বা ভারতীয় সময় প্রায় সকাল সাড়ে ১১টায় জাপানের হনসু প্রদেশের সেনডাই অঞ্চল থেকে ১৩০ কিমি পূর্বে বা টোকিও শহরের থেকে ৩৭৩ কি.মি উত্তর পূর্বে, সমুদ্রতল থেকে ২৪.৪ কিমি নীচে রিখটার স্কেলের ৮.৯ মাত্রার একটি বিশাল ভূমিকম্প হয়।

এই ভূমিকম্পটি ঘটেছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামুদ্রিক লিথোস্ফিয়ারিক প্লেট এবং উত্তর আমেরিকা (মূলতঃ মহাদেশীয়) প্লেটের মধ্যকার থ্রাস্ট ফল্ট বা উল্টো চ্যুতির ফলে। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র'র (৯৪২.৩৬৯° অক্ষাংশ এবং ৩৮.৩২২° দ্রাঘিমাংশ) কাছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামদ্রিক প্লেট উত্তর আমেরিকা প্লেটের তুলনায় পশ্চিম দিকে বছরে ৮৩ মিমি বেগে ধাবিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট জাপানের নীচে জাপান গিরিখাত বরাবর ইউরেশিয়া প্লেটের নীচে নেমে যায়। এই অঞ্চলে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরীয়, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরেশিয়া প্লেট অবস্থিত, যারা আবার কয়েকটি উপপ্লেটে বিভক্ত। এই কনভার্জেন্ট (পরস্পর অভিমুখী) প্লেট সীমান্তে চ্যুতির ফলে এই বিশাল মাত্রার ভূমিকম্প হয়। যা কিনা সুনামির মত প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণ।

জাপানের মানুষের কাছে সুনামি কোন অচেনা অজানা বিষয় নয়। বিগত কয়েক শতাব্দীতে জাপানের মানুষ অনেকবার সুনামি প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে এবারের সুনামি সাম্প্রতিককালের মধ্যে সর্ববৃহৎ। ভূমিকম্প ও সুনামি-র জেরে জাহাজ বন্দর থেকে ভেসে শহরে ঢুকে পড়েছে, লক্ষ লক্ষ ঘর-বাড়ি, বাস, ট্রেন ভেসে চলে গেছে, দাউ দাউ করে জ্বলেছে তৈল শোধনাগার। ১০ মিটার অর্থাৎ প্রায় ৩০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসে সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রায় সমগ্র জাপান বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং সবশেষে দাইচি পরমাণু চুল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটে বিশাল এলাকায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পড়েছে। ১১ই মার্চের ভূমিকম্প ও তার ফলে সৃষ্ট সুনামি-র জন্য যে শক্তি নির্গত হয়েছে তা ১৯৪৫ সালে সে দেশের হিরোসিমা দ্বীপে নিক্ষিপ্ত পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ থেকে নির্গত শক্তির তুলনায় প্রায় ২০ লক্ষ গুণ বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন। সুনামি ও ভূমিকম্প তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করে না বলে ক্ষতির পরিমাণ কম হলেও দাইচি-র পরমাণু চুল্লির বিস্ফোরণ গোদের উপর বিষফোড়া সৃষ্টি করেছে।

এখন প্রশ্ন হল, বার বার সুনামি ও ভূমিকম্প আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সেদেশে এত ক্ষতি হল কেন? আগে কি কিছুই বোঝা যায় নি?

প্লেট সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চল সবসময়ই ভূকম্প প্রবণ। ভূমিকম্প জাত সুনামি-ও এখানে নতুন নয়। এছাড়া ১১ই মার্চের ৮.৯ মাত্রার ভূমিকম্পের দুদিন আগে, অর্থাৎ ৯ই মার্চ ৭.২ মাত্রার বড় ভূমিকম্প এবং ১১ই মার্চ সকালে (বড় ভূমিকম্প ও তজ্জনিত সুনামি-র আগে) ২টি ৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয় একই অঞ্চলে। সে দেশের সরকার এই প্রাকৃতিক সতর্ক বার্তাকে কোন গুরুত্ব দেয় নি। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওসেন ইনফরমেশন সার্ভিস, হায়দ্রাবাদ-এর পক্ষ থেকে ১১ই মার্চ সকাল ৮টা ২২ মিনিটে প্রথম ওই অঞ্চলে ভূমিকম্প ও সুনামি-র পূর্বাভাস করেছিল। যে তথ্যটিকেও জাপান সরকার গুরুত্ব দেয় নি। ■

পাঠকের পাতা

দেবতার দান

সাঁঝ সকালে মন্দিরেতে
আরতি হতে থাকে
ভিক্ষারিণী ওই মেয়েটি
দাঁড়িয়ে দ্বারে দেখে।
পরনে তার কাপড় খানি
অতি ধূলা মলিন
জীর্ণবস্ত্র ছিন্ন কোথাও
কোথাও অশালীন।
দেবালয়ের পথের ধারে
যদি কিছু পায়,
ধূলার মাঝে লুটায়ে তাই
পথিক পানে চায়।

কেউ করে কৃপা দৃষ্টি
কেউবা বড় লোভী
কেউ দেখে মজার দৃশ্য
কেউবা তোলে ছবি।
হঠাৎ সেদিন সে একজন
গভীর ভালোবেসে
কথা দিল সাজিয়ে তোমায়
রাখব রানী বেশে।
সাজল মেয়ে অপরূপা
হল রাতের রানী
হল না সে মাতা কারো
কিংবা ঘরণী ॥

সোমা শীল

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু

ভারতে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব

ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানে গবেষণার কাজ যাদের হাত দিয়ে শুরু হয়েছিল, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু। তিনি যে সময়ে বিজ্ঞানে গবেষণা চালিয়েছিলেন, সেটি হল পরাধীনতার যুগ। দীর্ঘকালীন বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির পশ্চাৎপদতা, ইংরাজ অপশাসন ইত্যাদি বিবিধ কারণে তার আগে অবধি এক দীর্ঘকালীন সময় জুড়ে ভারতবর্ষে সেই অর্থে উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়নি। ফলে সেই সময়ের নিরিখে তাঁর আবিষ্কারগুলি এক বিরাট কৃতিত্বের দাবী রাখে।

তিনি আজকের বাংলাদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুরের "রাঢ়ীখাল" গ্রামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভগবান চন্দ্র বসু ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবানচন্দ্র ফরিদপুরে একটি বাংলা মাধ্যম স্কুল খোলেন ও তাঁর ছেলেকে সেখানেই ভর্তি করান। ১৮৬৯ সালে ভগবান চন্দ্র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পদ পেয়ে ফরিদপুর থেকে বর্ধমানে বদলি হয়ে আসেন। ১৮৭০ সালে হঠাৎ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বর্ধমান বিধ্বস্ত হয়ে উঠলো। তিনি সেই সাংঘাতিক অবস্থার ভার নিলেন। এই অবস্থায় পিতৃমাতৃহীন কিশোরদের কর্মসংস্থানের জন্য তিনি তাঁর বাড়ীর এক অংশে ছুতোরের কাজ শেখাবার, তামা-পিতলের দ্রব্য তৈরীর ও তাঁতবস্ত্রের কারখানা খোলেন। এখানে জগদীশ চন্দ্র যন্ত্র শিল্পীদের কাছ থেকে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরীর দক্ষতা অর্জন করেন। এরপর তিনি কলকাতার আসেন ও ইংরেজী শেখার জন্য সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও পরে কলেজে পড়ে বি.এ. পাশ করেন (১৮৭৯ সালে)। সেই সময় তাঁর কালাজ্বর হয়। ফলে অসুস্থ শরীরেই তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে যান ও সেখানকার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ায় তিনি সেই পড়া চালিয়ে যেতে পারেননি। এরপর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেন ও ১৮৮৫ সালে সেখানে Natural Science-এ "Tripos" পেলেন অর্থাৎ ৩টি শাখায় বি.এস.সি. পাশ করেন। একই সঙ্গে লন্ডন থেকেও তিনি বি.এস.সি. ডিগ্রী পেলেন যার জন্য তাঁকে আর কোন অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়নি।

এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিদ্যার অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। সেই সময় ঔপনিবেশিক নীতির কারণে এক ইউরোপীয় অধ্যাপক যে বেতন পেতেন - ভারতীয়রা তার এক তৃতীয়াংশ পেতেন। জগদীশচন্দ্র এই নীতির বিরোধিতা করেন ও দীর্ঘ তিন বছর বিনা বেতনে অধ্যাপনা চালিয়ে যান। এরপর ইংরেজ সরকার তাঁর দাবী মেনে নেয় ও ইউরোপীয়দের সমান বেতন প্রদান করে।

প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপক হিসেবে তিনি ছাত্রদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ নামে তাঁর এক ছাত্রের

মতানুযায়ী তিনি যেকোন বিষয় বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়ে সেই বিষয়টি পরীক্ষা করে যখন চোখের সামনে দেখিয়ে দিতেন তখন সেই জিনিষটি তাদের মনের মধ্যে ছবির মতো পরিষ্কার হয়ে যেত। তাঁর হাতে তৈরী অসংখ্য ছাত্র দেশ তথা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন - যার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা অন্যতম।

বৈজ্ঞানিক অবদান ঃ জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চার সময়ের আগের শতাব্দীতে ইংলন্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল "তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সমীকরণ" প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানী হার্জ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষাগারে এই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরী করার চেষ্টা করেন, তার সৃষ্ট তরঙ্গ দৃশ্য আলোকের সবকটি ধর্ম প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় (কারণ আমরা যে আলো দেখি অর্থাৎ দৃশ্য আলোক-ও একপ্রকার তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ)। তাঁর ব্যর্থতার প্রধান দুটি কারণ ছিল - প্রথমতঃ তাঁর দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কয়েকশো গজ (বড়) এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সূক্ষ্ম ধরণের ছিলনা। জগদীশচন্দ্র যে তরঙ্গ তৈরী করলেন তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ (খুবই ক্ষুদ্র)। অপরদিকে সেই তরঙ্গ ধরবার জন্য যে "গ্যালিনা ডিটেকটর" তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা পরবর্তীকালে বিনা তারে বার্তা পাঠানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, এরপরে তিনি ঐ তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ, পোলারাইজেশন ধর্ম পরীক্ষাগারে প্রমাণ করেন।

সেই সময় দেশের কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েই বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাস্তবতঃ কোন পরিকাঠামোই ছিলনা। কলেজের একটি পরিত্যক্ত বাথরুমে তিনি একান্ত নিজস্ব উদ্যোগে একটি গবেষণাগার তৈরী করেন। প্রথম পর্যায়ে নিজের মাইনে থেকেই গবেষণার যাবতীয় খরচ চালাতেন ও পরবর্তীকালে তৎকালীন ছোটলাটের উদ্যোগে তাঁকে মাসে ২৫০০ টাকা করে সরকারী অনুদান দেওয়া হয় ও তাঁকে ছমাসের জন্য ইংল্যন্ডে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলি দর্শন করার জন্য পাঠানো হয়।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিনা তারে তরঙ্গ প্রবাহের বিজ্ঞান আবিষ্কার করেন। এর প্রায় একবছর পর বিজ্ঞানী মার্কনি বিনাতারে তরঙ্গ সম্প্রচার (রেডিও সম্প্রচার) আবিষ্কার করে নোবেল পান। একবছর আগেই এই তরঙ্গ আবিষ্কার করা সত্ত্বেও জগদীশ চন্দ্র তাঁর আবিষ্কার পেটেন্ট না করায় রেডিও তরঙ্গের জনক হিসেবে প্রসিদ্ধ হননি। কারন বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়ার তিনি বিরোধী ছিলেন ও বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শও উপেক্ষা করেন।

১৮৯৭-এর ৫ই ফেব্রুয়ারি ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত হল "যে সকল যুক্তির ধারা অবলম্বন করে অধ্যাপক বসু বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, সেই যুক্তি এবং সব যন্ত্রের মধ্যে অধ্যাপক বসুর যন্ত্র যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে, সেই সত্য অতিশয় চমকপ্রদ। আশ্চর্য এই যে, এই যন্ত্র নির্মাণের কৌশল তিনি কোনো দিন লুকিয়ে রাখেননি, এবং পৃথিবীর লোকের এই যন্ত্র কাজে লাগাতে ও তা থেকে অর্থ উপার্জন করতে কোন বাধা নেই"।

এরপর জগদীশ চন্দ্র লন্ডনে গিয়ে পৌছলেন। তাঁর মৌলিক আবিষ্কার বিলেতের পত্রিকায় প্রকাশিত হল। তিন 'রয়্যাল ইনস্টিটিউশন'-এ বক্তৃতা দিলেন - সকলে শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। এরপরে তিনি যথাক্রমে প্যারিসের 'ফিজিকাল সোসাইটি বার্লিনে, সরবোনে, কিল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ডাক পেতে থাকলেন। বৈজ্ঞানিকরা তাঁর গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকলো। এ প্রসঙ্গে লন্ডনে টাইমস পত্রিকা লিখলো -

"যখন আমরা চিন্তাকরি যে ডাঃ বসু কলকাতায় বিজ্ঞানের অধ্যাপনার অবিরত কর্তব্য করে তারপর তিনি এইসব মৌলিক গবেষণা করেছেন এবং যে সমস্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে তিনি তথ্য আবিষ্কার করেছেন সেগুলি এদেশে অতি স্বল্প বলেই বিবেচিত হয় তখন তাঁর আবিষ্কারের মূল্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি"। সামগ্রিক ফলস্বরূপ প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৯১৪ সালে একটি সম্পূর্ণ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হল।

এতদিন জগদীশ চন্দ্র তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এরপর তিনি জড় পদার্থ ও জীব নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, তিনি দেখালেন যে বাইরে থেকে উত্তেজনা প্রয়োগ করলে যেমন প্রাণীদেহ সাড়া দেয়, তেমনই উদ্ভিদদেহও প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সাড়া দেয়। যেমন লজ্জাবতী লতাকে ছুঁয়ে দিলে পাতাগুলি গুটিয়ে যায় (প্রত্যক্ষ সাড়া)। অপরদিকে আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছকে আঘাত করলে বা উত্তেজনা প্রয়োগ করলে তার আহত অংশের সুবিন্যস্ত অণুগুলি বিকৃত হয়ে পড়ে। ফলে কোষের ভিতরের জলীয় অংশ বার হয়ে ও আহত স্থান থেকে সুস্থ অংশের দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালনা করাকে জগদীশচন্দ্র আণবিক বিকারের প্রধান লক্ষণ বলে মনে করেছেন। তিনি যন্ত্রের সাহায্যে এই অপ্রত্যক্ষ সাড়াকে পরীক্ষা করেও দেখান। পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞানীদের এসব বিদ্যা ছিল ধারণার অতীত, তাই জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগতে একটা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। গাছের বৃদ্ধি নির্ণয় করার জন্য তিনি সমতল ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ক্রেসকোগ্রাফ থেকে জানা গেছিল যে গাছটি এক মিনিটে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের বিয়াল্লিশ ভাগ করে বাড়ছিল। এছাড়াও তিনি পেশীকোষে উত্তেজনার প্রভাব, বিষের প্রভাব নিয়েও পরীক্ষা করেন। জগদীশ চন্দ্রের ধারণা ছিল

নার্ভতন্ত্র না থাকলেও উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা হর্মোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরপর তিনি ১৯০০ সালে প্যারিসের আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসে ও তারপর লন্ডনে রয়্যাল ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা দিতে যান। বিষয় ছিল "যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড় পদার্থের সাড়া"। এরপর ইংল্যন্ডের পদার্থবিদরা ওখানকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে জগদীশ চন্দ্র ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০০-তে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখলেন - **"এখন বলুন কি করি ? একদিকে আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি - যাহার কেবল out skirts লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ amateurish রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্যদিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা। আমার সমস্ত inspiration-এর মূলে আমার স্বদেশী লোকের স্নেহ। এই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রইল ?"**

জগদীশ চন্দ্র তার পরীক্ষার ফলাফল দুখানি বিরাট গ্রন্থে প্রকাশ করলেন - একখানি হল Response in the living and Non-living ও আরেকটি হল Plant Response : as a means of Physiological investigation, যেগুলি ইংলন্ডে প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি জড় ও জীবের মধ্যে যে সীমারেখা টানা হয় তাকে শুধরে দিলেন। তিনি বললেন, যে শক্তি সজীব পদার্থের মধ্যে একটা শক্তির খেলা দেখায় সেই শক্তিটাকে আগেকার বৈজ্ঞানিকরা "জীবনী শক্তি" নাম দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বললেন যে, **বাইরের শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে যে আণবিক বিকৃতি এসে দেহের অণুগুলোকে আক্রমণ করে তাই দেহের ভিতরে রাসায়নিকের কাজ করে, ফলে যে শক্তি পদার্থবিদ্যার অনুমোদনে জড়ের উপর কাজ করে সেই শক্তিই জীবের উপরও কাজ করে।**

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে সি. এস. আই. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। এই সময়ে তাঁর আরও একটি বই প্রকাশিত হয় যার নাম "উদ্ভিদের উত্তেজনাশীলতা"। তখন ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগদীশচন্দ্রের কাছে বক্তৃতার আহ্বান এল। তাই ১৯১৪-তে ভারত গভর্নমেন্ট তাঁকে পুনরায় চতুর্থ অভিযানে পৃথিবী ভ্রমণে পাঠালেন। এইবার রয়্যাল ইনস্টিটিউটের বক্তৃতার সময় তাঁকে **"উইজার্ড অফ দি ইস্ট"** অর্থাৎ প্রাচ্যের জাদুকর আখ্যা দেওয়া হয়। এরপর তিনি ভিয়েনা, প্যারিসে, আমেরিকায় ও জাপানে এক দীর্ঘকালীন বৈজ্ঞানিক সফর সেরে ভারতে ফিরে আসেন। ঐ সকল বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁর আবিষ্কার ও গবেষণা এক আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ও ঐদেশের গবেষকরা তাঁদের ছাত্রদের ভারতে জগদীশ চন্দ্র বসুর অধীনে গবেষণার জন্য পাঠানোর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ঐ দেশের পত্রিকায় তাঁর বক্তৃতাগুলির উপর লেখা বেরোতে থাকে। ঐ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া দরকার।

"London daily News" পত্রিকার সম্পাদক লিখলেন, "Just now Prof. J.C. Bose is giving people shows in Maida Vale If you watch his astonishing experiments with plants and flowers you have to leave an old world behind and enter a new one. The world where plants are merely plants becomes mercilessly out of date and you are forced abruptly into a world where plants are almost human beings". Prof. Bose makes you take the leap when he demonstrates that plants have a nervous system comparable with that of men and makes them write down their life history. So you step into yet another world..... ."

বিলেতের সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক পত্রিকা " নেশন", ও আমেরিকার "New York Times" ও জগদীশ চন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ করে।

ভারতে ফিরে আসার পর রামমোহন লাইব্রেরি থেকে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ১৯১৫ সালে তাঁর অবসর গ্রহণের পর গভর্নমেন্ট তাঁকে চিরদিনের জন্য পুরো বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে 'ইমেরিটাস' অধ্যাপক বলে স্বীকার করলেন। তিনি ১৯১৬-তে "নাইটহুড" উপাধি পান; ১৯১৭ সালের ১লা জানুয়ারী ভারত সরকার তাকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর তিনি 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী ও যুগলকিশোর বিড়লা প্রভৃতি এই মন্দির প্রকল্পে অর্থসাহায্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে "আবাহন" শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করে পাঠিয়েছিলেন, সেটিও ঐদিন পাঠ করা হয়। এরপর জগদীশ চন্দ্র "নিবেদন" প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এরপরও তিনি তিনবার ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন।

এই সময় প্রচন্ড পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে থাকলো। তাঁর বন্ধু নীলরতন সরকারের উদ্যোগে তিনি সস্ত্রীক গিরিডিতে এক রায়বাহাদুরের বাড়ীতে বিশ্রাম নিতে গেলেন। তার বাড়ীতেই ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর বিজ্ঞান জগতের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কর্নু ১৮৯৭ সালে জগদীশ চন্দ্র সম্পর্কে বলেন "আপনার

আবিষ্কারের দ্বারা আপনি বিজ্ঞানকে বহুদূর অগ্রসর করে দিয়েছেন। দু হাজার বছর আগে আপনার পূর্ব পুরুষেরা মানবসভ্যতায় অগ্রণী ছিলেন এবং বিজ্ঞানে কলাবিদ্যায় জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক জগতের সামনে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। আপনি আপনার পূর্ব পুরুষদের গৌরবকীর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করুন।" উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় যে যে সময় তিনি গবেষণাজগতে আসেন তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার মানচিত্রে ভারতবর্ষের নাম ছিল না। ফলে সেই সময়ের স্বাপেক্ষে তার আবিষ্কারগুলি যে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছিল সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। বর্তমানে জৈব পদার্থ বিদ্যা (Biophysics) বলে বিজ্ঞানের যে শাখাটিতে সারা পৃথিবী জুড়ে রমরমিয়ে কাজ হচ্ছে তার জনক জগদীশচন্দ্রকেই বলা যায়। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। তৎকালীন সময়ের যে সকল অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র, ধর্মগুরু, কোয়াক ডাক্তার প্রভৃতির বিরোধিতা করেছিলেন। "ভাগীরথির উৎস সন্ধানে" বইটিতে তিনি গঙ্গার শিবের জটা থেকে উৎপত্তির ধর্মীয় ব্যাখ্যাটিকে খন্ডন করেন ও বলেন যে হিমবাহের বরফ গলেই তার উৎপত্তি। তবুও তিনি ইশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন, যদিও তিনি গাছের ভিতরের শক্তি যে পদার্থবিদ্যার শক্তি থেকে আলাদা কিছু নয় এই কথাও বলেন। তথাপি এই মহাবিশ্ব কোন এক অজ্ঞাত শক্তি পরিচালনা করছে এমন ধারণাই পোষণ করতেন। 'নিবেদন' প্রবন্ধে তিনি বলেন "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত দুই একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস করিতে হয়" - এই কথাগুলি থেকে তার ভাববাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

সর্বশেষে বলা যায় তিনি যে সময়ে গবেষণা জগতে একজন উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র হয়ে উঠছেন সেই সময়েই ভারতবর্ষে চলছে এক চূড়ান্ত অশান্ত অবস্থা - চলছে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম। দেশের বিপ্লবী যুবক-যুবতীরা তাদের সুখদুঃখ বিসর্জন দিয়ে দেশের মানুষকে স্বাধীনতা এনে দেওয়ার সঙ্কল্পে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র, ভগৎ সিং প্রভৃতি বিপ্লবীরা উজ্জ্বল কেরিয়ার বিসর্জন দিয়ে দেশের মুক্তিকল্পে নিজেদের উৎসর্গ করছেন। দেশের মানুষ দলে দলে এই মহান নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। অন্যদিকে ঐ ইংরেজ সরকারেরই অনুমোদনে জগদীশ চন্দ্র ঐ সময় গবেষণার উদ্দেশ্যে ইউরোপ যাত্রা করছেন। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে তিনি কোন ভূমিকাই রাখেননি। আসলে তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতবাসী নিজেদের গুণে যদি ইংরেজদের মন জয় করতে পারে তাহলেই দেশের উন্নতি সম্ভব। অন্যদিকে ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র অর্থাৎ সাধারণ মানুষের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছে। সারা পৃথিবীর কাছে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছে। ভারতের বিপ্লবীরাও সাম্যবাদী মতাদর্শে প্রভাবিত হতে শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে জগদীশ চন্দ্র তাঁর এক ছাত্রের হাতে কাস্তে হাতুড়ির ছবি দেওয়া একটি বই দেখতে পেয়ে তাকে বলেন "Sickle and hammer both are useful instruments. They should be honoured. But will it be good if we do it by doing a pen ? Markings of pen are also needed for propagating the virtue of sickle and hammer". বুদ্ধিজীবীরা নয়, সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকাই প্রধান হয় এবং সমাজ পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবীরা তার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে পারেন মাত্র; ফ্রান্স বা রাশিয়ার বিপ্লব থেকে তিনি হয়ত এই শিক্ষা আত্মস্থ করতে পারেন নি। তাছাড়া সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া শুধু শিক্ষার প্রসার যে সমাজের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান পাল্টাতে পারে না - এ ধারণাও হয়তো তাঁর ছিল না, তাই এই মন্তব্য। একটা পরাধীন জাতির অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা জীবনযাত্রার বিকাশের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির প্রশ্নটাই যে প্রধান, অত্যাধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জগদীশ চন্দ্রের তা অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নীরব দর্শক। সমাজের নীচুতলার মানুষের স্বার্থে, তাদের আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষার প্রসারেও তাঁর কোন ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। দেশের কোটি কোটি নিরক্ষর ও কুসংস্কারের অন্ধকারে থাকা মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার মত উল্লেখযোগ্য ভুমিকাও আমরা দেখতে পাই নি বরং তাঁর কর্মজীবনে তিনি যা করেছেন, তার বিপরীতে ভাববাদী দর্শনের প্রচারই আমরা তাঁর বিভিন্ন ভাষণে ও রচনায় পেয়েছি।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সততা, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা - দায়িত্ববোধ কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না। চূড়ান্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে পড়েও তিনি বিজ্ঞানের আবিষ্কারের প্রতি পরিশ্রমে, ভালোবাসায় কোন অভাব রাখেননি। তিনি তাঁর গবেষণার প্রতিই নিজের সারা জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। বিজ্ঞান তাঁর গবেষকের বা ছাত্রের কাছে এটিই সবার আগে দাবী করে। তাই সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানমনস্ক না হতে পারলেও, সামাজিক আন্দোলনে সময়োপযোগী ভূমিকা না রাখতে পারলেও, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এক যুগান্ত কারী ব্যক্তিত্ব। ■

জৈব প্রযুক্তির মহা আবিষ্কার
ক্লোনিং

উৎপল ভট্টাচার্য

বিজ্ঞান তার আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানব জীবনে স্বাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধি এনেছে। বিজ্ঞান রথে আসীন হয়েই মানুষ জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। আবিষ্কারের জন্ম হয় প্রয়োজনের তাগিদেই। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনকে মেটাতেই। বিংশ শতাব্দীতে মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সজীব উপাদান সামগ্রী কম সময়ের মধ্যে উৎপাদনের জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে ক্লোনিং পদ্ধতি। জৈব প্রযুক্তির এই অভিনব এবং বিস্ময়কর আবিষ্কার মানব জীবনে এনেছে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি।

ক্লোনিং পদ্ধতিতে জিনগতভাবে অভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বহুজীব বা বহুকোষ সৃষ্টি করা যায়, DNA-এর একটি অংশের বহু প্রতিলিপি তৈরী করা যায়। এর ফলে সৃষ্ট জীব বা কোষগুচ্ছ বা DNA-এর প্রতিলিপিগুলিকে বলে ক্লোন। ১৯৫৫ সালে বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রিগস এবং টম কিং কোশের সাইটোপ্লাজমের প্রভাবে নিউক্লিয়াসস্থিত জিনের কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনের ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর ১৯৬০ সালে জে. বি. গর্ডন Xenopus Laevis নামক ব্যাঙের অনিষিক্ত নিউক্লিয়াস মুক্ত ডিম্বাণুর মধ্যে ব্যাঙাচির পাচননালির কোশের নিউক্লিয়াস ঢুকিয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ সৃষ্টিতে সমর্থ হন। পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালে বিজ্ঞানী ইয়ান উইলমুট ও কিথ এইচ এস ক্যাম্বেল ভেড়ার ক্লোনিং করেন। তাঁরা ৬ মাস বয়সের ফিন ডরসেট স্ত্রী ভেড়ার স্তনগ্রন্থির বাঁট থেকে কোশ নিয়ে সেটিকে বিশেষ পালন মাধ্যমে রেখে তাদের Go দশায় নিয়ে যান। পাশাপাশি তাঁরা একটি স্ত্রী পল ডরসেট ভেড়া থেকে পরিণত অনিষিক্ত ডিম্বাণু সংগ্রহ করেন এবং এর নিউক্লিয়ার বের করে এর মধ্যে স্তনগন্থি কোশের নিউক্লিয়াস ঢুকিয়ে দেন (পালন মাধমে রেখে সামান্য বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে নিউক্লিয়াসের সংযোজন ঘটে)। এরপর পালন মাধ্যমে ডিম্বাণুকে আর একবার বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার ফলে এটি বিভাজিত হয়ে ব্লাস্টোসিস্ট গঠন করল।

এরপর উইলমুট ও ক্যাম্বেল ব্লাস্টোসিস্টটিকে কালো

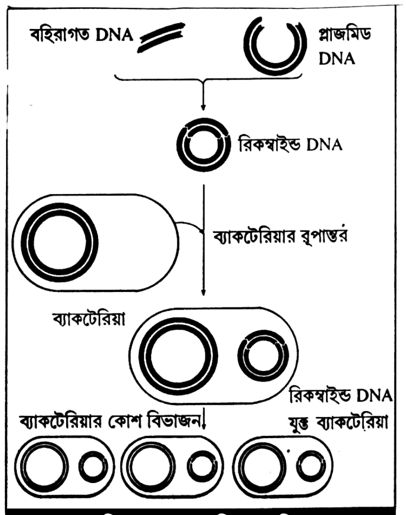

ডি এন এ ক্লোনিং পদ্ধতি

মুখের স্ত্রী ভেড়ার (ধাত্রী মা) জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করেন। এর পাঁচ মাস পরে ধাত্রী মা ভেড়া ডলি নামে শাবকের জন্ম দেয় (১৯৯৭)। ডলি ছিল হুবহু ফিন ডরসেট স্ত্রী ভেড়ার মতো।

একই সময় ১৯৯৬ সালে ড. ডোনাল্ড উলফ্ ও তাঁর সহকর্মীগণ রেসার বাঁদরের ক্লোন তৈরী করতে সমর্থ হন। প্রফেসর লু গুয়াং জিন বেজিং-এর পুনাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঁদুরের ক্লোন তৈরী করেন।

এই ক্লোনিং পদ্ধতিতে DNA-এর বহু প্রতিলিপি তৈরী করা হয় যা আজকাল খুবই জনপ্রিয়। এই পদ্ধতিতে ইনসুলিন জিন, বৃদ্ধি হরমোনের জিন, ইন্টারফেরন জিন প্রভৃতি তৈরী করা হয়। যেসব মানুষ এবং প্রাণীর দেহে ইনসুলিন, গ্রোথ হরমোন, ইন্টারফেরন প্রভৃতি পদার্থ স্বাভাবিক পরিমাণে উৎপাদিত হয় না তাদের ক্ষেত্রে এই ক্লোন করা জিন প্রয়োগ করা হয় এবং তারা স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারে।

জিন ক্লোনিং করা হয় কিছু নীতি মেনে। প্রথমে একটি জিন বা DNA-এর যে খন্ডটিকে ক্লোন করা হবে তাকে

রেসট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক দিয়ে কাটা হয়, ফলে DNA-এর দুপ্রান্তে আঠালো অংশ সৃষ্টি হয়। এই একই উৎসেচক দিয়ে ভেক্টর বা বাহক DNA-কে কেটে দেওয়া হয়। এরপর লাইপেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে জীবের DNA ও ভেক্টর DNA-কে মিশিয়ে বিক্রিয়া ঘটানো হয়। ফলে দুটি DNA পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে যুক্ত হয়ে রিকম্বিন্যান্ট DNA তৈরী করে। ব্যাকটেরিয়া কোশের ভিতর এই রিকম্বিন্যান্ট DNA স্বাভাবিকভাবে প্রতিলিপি গঠন করে, ফলে জীবটির জিন বা DNA-এর অনেকগুলি একইরকম ক্লোন তৈরী হয়।

ক্লোনিং পদ্ধতির আরো একটি দিক হল উদ্ভিদ ক্লোনিং। অনেক উদ্ভিদের বীজ উৎপন্ন হয় না। অনেক উদ্ভিদ হল অসম বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এগুলি যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করলে অপত্য উদ্ভিদে যথেষ্ট প্রকরণ দেখা যায় ফলে গুণগুলির অবনমন ঘটে। এদের ক্লোনিং পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করানো হয়। কোশ পালন পদ্ধতিতে উদ্ভিদের ভাজক কলা সংগ্রহ করে কলা পালন তরলে রাখা হয়। কোশগুলি আস্তে আস্তে বিভাজিত হয়ে সম্পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হয়। এই অপত্য উদ্ভিদে জেনোটাইপ অপরিবর্তিত থাকে, এদের ক্লোন বলে। বিভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে এই পদ্ধতির জন্য নির্বাচিত করা হয়। সর্বদা সবল উদ্ভিদ থেকে উৎকৃষ্ট চরিত্রের ক্লোনগুলি নির্বাচিত করা হয়। অনেক সময় দুটি পৃথক ক্লোনের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়ে সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় এবং উৎকৃষ্ট মানের সংকর উদ্ভিদের সংখ্যা বাড়িয়ে চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন আখ কলা KO11, KO22, কলা বোম্বে গ্রিন্ড-হাই গ্রেড; আলু কুফরি রেড ও কুফরি সফেদ; কমলা যুবরাজ ব্লাডরেড ইত্যাদি ক্লোন নির্বাচন থেকে উন্নত ভ্যারাইটি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

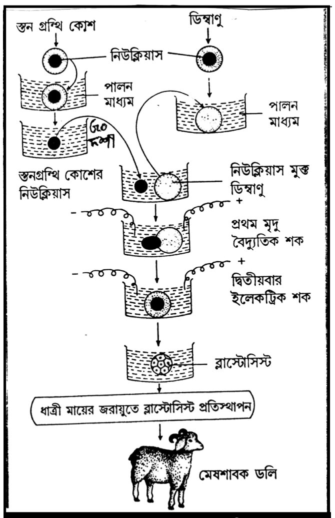

উইলমুটের ক্লোনিং পরীক্ষা

ক্লোনিং পদ্ধতিতে উন্নত প্রাণীদের দেহ কোশ বা দেহাংশ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি করা যায়। এর ফলে অর্থকরী প্রাণীদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং উন্নততর প্রাণী সৃষ্টি করা হয়। অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের সংখ্যাও এই পদ্ধতিতে বৃদ্ধি করা হয়। ফলে মানবজীবন আরো সমৃদ্ধ হয়। এই পদ্ধতিতে বিপন্ন, লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংরক্ষণ করা এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ক্লোনিং ঘটিয়ে সাধারণ জনন পদ্ধতির চেয়েও বেশি সাফল্য পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে অপত্য জীব সৃষ্টির জন্য পুরুষ জীবের দরকার হয় না। অনেক উদ্ভিদে ফুল-ফল আসার জন্য দীর্ঘ শৈশব অবস্থা অতিক্রম করতে হয়, ক্লোনিং পদ্ধতির সাহায্যে সেই সময় সংক্ষিপ্ত করা যায়। উদ্যান বিদ্যায় এই পদ্ধতি অনেক সুফল এনেছে।

ক্লোনিং পদ্ধতিতে মানব সমাজের ব্যাপক কল্যাসাধন করা গেলেও এটি খুব ব্যয়সাপেক্ষ। এছাড়াও কিছু সংখ্যক মানুষ তাদের ব্যক্তিস্বার্থের জন্য এই পদ্ধতির সুফল সমগ্র মানব সমাজে বর্ষিত হতে দিচ্ছে না। এই পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে মুনাফা লাভের জন্য, সব মানুষের দরকার মেটানোর জন্য নয়। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এই পদ্ধতি নিছকই স্বপ্ন তুল্য। তবে অর্থকরী উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টির মাধ্যমে এই পদ্ধতির সুফল বেশীরভাগ মানুষের কাছে কমবেশি পৌঁছেছে।

ক্লোনিং পদ্ধতির এতসব উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও এর কিছু অসুবিধা আছে। এই পদ্ধতিতে একই রকমের একাধিক জীব সৃষ্টি করা হয় বলে এটি জীববৈচিত্র সৃষ্টির পরিপন্থী। এর ফলে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় না। প্রাণীদের ক্ষেত্রে ক্লোনিং ঘটানোর জন্য ডিম্বাণুদাত্রী একটি স্ত্রী প্রাণী ছাড়াও অতিরিক্ত ধাত্রী স্ত্রী প্রাণীরও প্রয়োজন হয়।

এই পদ্ধতির সাফল্যের হার কম এবং উৎপন্ন অপত্য জীবের মৃত্যু হার বেশি। ফলে এই পদ্ধতির মানব তথা জীবের কল্যানে প্রয়োগ সীমিত।

ক্লোনিং প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম অপুংজনি (পার্থেনোজেনেসিস)। এই পদ্ধতিতে সৃষ্ট জীব এর আয়ুষ্কাল খুব কম। আয়ুস্কাল কম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান ও তা থেকে মুক্তির উপায় আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিকভাবে ক্লোনিং পদ্ধতি মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ নিষেধ করা হয়েছে। ক্লোনিং পদ্ধতিতে নতুন মানব সন্তান সৃষ্টি করার বাস্তব অসুবিধাটি হল, স্বল্প আয়ুস্কাল। প্রজাতিগত অসুবিধাটি হল যৌন জননের পরিবর্তে ক্লোনিং পদ্ধতি, প্রজাতির **অটোজেনেটিক** ও **ফাইলোজেনেটিক** উন্নতির পরিপন্থী। সামাজিকভাবে অসুবিধাটি হল ক্লোনিং পদ্ধতি ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিমূল উচ্ছেদ করতে চায়।

বর্তমান সমাজ পরিচালনার নীতি অনুযায়ী, অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এর মতন, ক্লোনিং পদ্ধতির সুফল সকলের চোখের সামনে থাকলেও অধিকাংশের হাতের নাগালের বাইরে আছে এবং থাকবে। ■

পরীক্ষায় টোকাটুকি ও অনৈতিকতা

সংযুক্তা চক্রবর্তী

বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় টুকলি সরবরাহ ও নকল করা নিয়ে চারদিকে এক গেল গেল রব উঠেছে। অনেকেই মনে করছেন এ এক অশনি সংকেত – নৈতিকতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবনতির প্রকাশ। শুধু হইচই- এ কান না দিয়ে বিষয়টির কার্য কারণ খুঁটিয়ে বিচার করা যাক।

পরীক্ষায় নকল করা যদি মানুষের নৈতিক অধঃপতনের প্রকাশ হয় তবে এই নৈতিক অধঃপতনের কারণ কী ?"Most human beings have a breaking point and when anything threatens a man's livelihood, income or social status, they are put in a survival mode. In other words, when the existence of an individual is threatened, they are tempted to reach their moral breaking point." এছাড়া নৈতিকতা কোন বস্তুনিরপেক্ষ ও শাশ্বত বিষয় নয়। সমাজ ব্যবস্থা যেমন হয়, একটা সমাজে মানুষে মানুষে যেমন সম্পর্ক হয় তার উপর নৈতিকতা নির্ধারিত হয়। পুঁজি বিনিয়োগকারী শিল্পপতির কাছে শ্রম শোষণ করে মুনাফা অর্জন করা নৈতিক বিষয় আবার এই শোষণের বিরুদ্ধাচারণ করা সেই শিল্পের শ্রমিকের চোখে নৈতিক।

প্রতিটি দেশেই শাসকরা তাদের প্রয়োজনে শিক্ষানীতি গ্রহণ করে। ইংরেজ শাসনে 'রক্তে মাংসে ভারতীয় কিন্তু আচার আচরণে ইংরেজ' তৈরী করার জন্য শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৯৫০ সালে সরকার ঘোষণা করেছিল সংবিধানের ৪৫ নং ধারা অনুযায়ী ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বছরের বয়সী সকলের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হবে, নিরক্ষরতা দূর হবে ইত্যাদি। ১০ বছর তো কোন ছাড় গত ৬০ বছরেও এসব কিছু হয়নি। ১৯৮৫ সালের নয়া শিক্ষানীতিতে বলা হল যে সকলকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনলে এক বিশাল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষার লাইনে ভিড় করবে। এতে শিক্ষা খাতে বাজেটের উপর চাপ বাড়বে। তাই সরকারকে আর্থিক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য "এর বিকল্প হিসাবে অন্যরূপের শিক্ষা, যেমন অ-প্রাতিষ্ঠানিক (নন ফর্ম্যাল), দূরবর্তী শিক্ষা (ডিসট্যান্ট এডুকেশন) এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।" (দ্রষ্টব্য ঃ চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশন বা নয়া শিক্ষানীতির পয়েন্ট ৪.৬৪)। এই পলিসিতে বলা হয়েছে "চলতিরূপের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আরও বাড়ানো কিছু দিনের জন্য বন্ধ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষা কেবল এমন লোক সৃষ্টি করছে যারা রোজগার পাবার অযোগ্য" (চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশন পয়েন্ট ৪.৮৩)। চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশন এর ৪.৮৬ পয়েন্টে বলা হয়েছে যে উচ্চশিক্ষায় কেবল সেই সমস্ত ছাত্রদেরই সুযোগ দেওয়া উচিৎ যাদের শিক্ষাগত রেকর্ড ভাল। বিশেষ রকমের পরীক্ষার দ্বারা এইসব ক্ষেত্রে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

সুতরাং ডিগ্রি বা পরীক্ষার নম্বর থেকে চাকরী বা উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার যোগ্যতাকে পৃথক করা উচিৎ বলে যে নীতিকথা শোনা যায় তার কোন ভিত্তি নেই। কোন কর্মক্ষেত্রে ঢুকতে হলে প্রয়োজন হয় ডিগ্রির। ছোট, বড় এমন কোন চাকরি নেই, জেনারেল –, ভোকেশনাল এমন কোন শিক্ষা নেই যেখানে ঢুকতে গেলে 'কি পাশ', কোন ডিভিশনে পাশ, কত নম্বর পেয়ে পাশ - এটা জানতে চাওয়া হয় না। ফলত ছাত্র-ছাত্রীরা তো পাশ দিয়ে রাখতে বা নম্বরটা যথা সম্ভব বাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করবেই। 'কিভাবে পেলাম' সেটা বড় কথা নয় কিন্তু 'কত পেলাম' সেটাই একজন ছাত্র বা তার অভিভাবকদের কাছে আসল কথা। তাছাড়া 'কিভাবে পেলাম' সেটা বিচার করার কোন মানদন্ড কি এই শিক্ষা ব্যবস্থায় আছে ? সারা বছর ধরে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রকৃত কোন ব্যবস্থা নেই। হাল আমলের ইউনিট টেস্টের ব্যবস্থা বা উচ্চশিক্ষার সেমিস্টার সিস্টেম একজন ছাত্র-ছাত্রীর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারে না। কোন চূড়ান্ত পরীক্ষাই তাই হয়ে ওঠে সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি। ওখানে ব্যর্থতা মানে এই ইঁদুর দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া। তাই "যে কোন মূল্যে সাফল্য চাই-ই চাই, টুকে পেলে তাই সই।"

এখন আবার এই টোকাটুকির অনেক আধুনিকীকরণ হয়েছে। শুধু টুকতে জানলেই হবে না, কি টুকবো তাও জানতে হবে। এই কাজে শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা নয়, অভিভাবকরাও নেমে পড়েছেন সাহায্যে। খবরের কাগজে, টিভিতে বিজ্ঞাপণ হচ্ছে। আগাম মোটা পয়সা খরচা করলে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি যদি অনৈতিক এবং অবৈধ না

হয় তবে শুধু টোকাটুকি অনৈতিক ও অবৈধ হবে কেন ?

একজন ছাত্র তার ছাত্রজীবনে যা পড়ছে, যা শিখছে কর্মজীবনে সেটা খুব কম ক্ষেত্রেই কাজে লাগে। সাহিত্য, ভৌতবিজ্ঞান বা দর্শন নিয়ে পড়াশুনার পর কেরানীর চাকরি পাওয়া কোন ছেলে বা মেয়ের জীবনে তার প্রাপ্ত শিক্ষা প্রয়োগ করার কোন জায়গা থাকে না। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর লক্ষ্য যেহেতু 'রোজগেরে হওয়া' প্রাপ্ত শিক্ষার প্রয়োগ নয় – তাই জ্ঞানার্জন নয়, পরীক্ষায় পাশ করা বা নম্বর বাড়ানোটাই একমাত্র লক্ষ্য থাকে। এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য টোকাটুকি-তে অধিকাংশের তাই কোন দ্বিধা নেই। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পঠনপাঠন অধিকাংশ ছাত্রের কাছে এমন নৈতিকতা তুলে ধরে না যাতে টোকাটুকি তার অনৈতিক মনে হয়।

স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা পড়ার সাথে নিজেদের চেনা জানা জগৎকে মেলাতে পারে না। সিলেবাসে গঙ্গা নদীর চেয়ে অনেক বেশি জানতে হয় নীল নদ সম্বন্ধে। এদেশের ইতিহাস, ভূগোলের চেয়ে ইউরোপের ইতিহাস ও ভূগোল বেশি পড়তে হয়। আমরা যে ইতিহাস পড়ি তার কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয় না। তাই ইতিহাস হল রাজা-রাজপুত্র-সীমানা-যুদ্ধ-সাল-তারিখ এসব ঘটনার ঘনঘটা-দৈনন্দিন জীবনে এসব অপ্রয়োজনীয়। তাই মুখস্ত করাটাই ছাত্রদের একমাত্র কাজ। পরীক্ষায় একজন মুখস্ত করে লিখল, একজন ভুলে গিয়ে তা পারল না, আর অপরজন টুকে লিখল। প্রথম আর তৃতীয়জনকে সমাজে সফল বলা হয়। তৃতীয়জন সফল হয়েছে বলে সমাজ রসাতলে গেল কতজন এমন ভাবেন!

সামাজিক শিক্ষাই একজন ছাত্রের নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে। একজন ছাত্রের নৈতিক মূল্যবোধ প্রথমে গড়ে ওঠে পরিবার থেকে। সে মাকে দেখে স্বার্থপরতা শেখে, বাবাকে দেখে কর ফাঁকি দেওয়া শেখে, রাজনৈতিক নেতাদের দেখে চুরি রাহজানি-দুর্নীতি শেখে, শিল্পপতিদের দেখে শোষণের ন্যায্যতা শেখে। এসব সামাজিক শিক্ষার শাঁস কী? এক কথায় 'যেভাবে পার সফল হও'। 'যে কোন মূল্যে সাফল্য চাই, না হলে দূর হও' – এই যদি সমাজের চালিকাশক্তি হয় তবে টোকাটুকি অনিবার্য ! ছাত্রছাত্রীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। 'শিরে সর্পাঘাত হলে কোমরে তাগা বেঁধে' লাভ হয় না। তাই এই পচাগলা শিক্ষা ব্যবস্থা তথা সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে দুর্নীতিটাই নীতি, সেখানে টোকাটুকি অনৈতিক এটা বলে কোন লাভ হবে না। সমাজের অধিকাংশ মানুষের প্রয়োজনে যেদিন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, পরীক্ষায় পাশ করা, বড় নম্বর পাওয়া নয়, জ্ঞানার্জন, আর তা মানব সমাজের কল্যাণে ব্যবহার যখন লক্ষ্য হবে টোকাটুকির অবসান সেদিন হবে। ■

পাঠকের পাতা

শিশুর অধিকার

যে শিশু আজ প্রভাতে জন্ম নিয়েছে মাতৃগর্ভ থেকে,
যে শুধু তোমার আমার নয় –
এ পৃথিবীর সন্তান হয়ে সে বাঁচতে এসেছে ॥
তাকে মুক্ত বায়ু দাও, মুক্ত আলোয়–
মাথা গোঁজায় ঠাঁই দাও; দাও–
হৃদয়ের অকৃপণ ভালোবাসা ॥
জ্ঞান হতেই সে যেন না বোঝে
আমি দরিদ্রের সন্তান
ঘর বলতে যেন না বোঝে
ফুটপাথ কিংবা ঝুপড়ি ॥

ওদের নবীন তাজা প্রাণগুলি
অকালে ঝরিয়ে দিওনা তোমার
কালো রোজগারের অন্ধ গলিতে ॥
তোমার অনাহারের উচ্ছিষ্টে যেন –
বেঁচে থাকতে না হয়।
তাকে বাঁচতে দাও স্বাধিকারে, তার চোখে
চেয়ে দেখো সে তোমাদেরই অতি পরিচিত
এই পৃথিবীর এক সন্তান ॥

– ভারতী ঠাকুর

রাজীব দাসের মৃত্যু – একটি ময়না তদন্ত

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতে, রাত পৌনে বারোটা নাগাদ, দিদি রিঙ্কু দাস-এর সম্মান রক্ষা করতে ১৬ বছরের ভাই রাজীব দাস-এর নৃশংস হত্যাকান্ডের- খবর এ রাজ্যের সকল সংবাদ মাধ্যমের প্রধান সংবাদের জায়গা দখল করে নিয়েছিল। সংসদীয় রাজনৈতিক দল ও নেতাদের, রাজীব দাস-এর মৃত্যু ও মৃতদেহকে, ভোটের বাজারে কেনাবেচার নির্লজ্জ সক্রিয় ভূমিকা, বারাসাতের জনগণের ও রাজীব দাসের পরিবারের ধিক্কারের মুখে পড়ে।

প্রশ্ন উঠেছে কার দোষে এমন ঘটনা ঘটল ? বাংলোর রক্ষীদের ? নাকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ? নাকি সার্বিক আইন শৃঙ্খলার গাফিলাতি ? নাকি ... ?

"রেল" থেকে "মহাকরণ" এই ঘটনার প্রতিকার করার আশ্বাস দিয়েছে এবং পরিবারটিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে, যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে দোষীদের গ্রেপ্তার ও চিহ্নিত করার কাজ শেষ হয়েছে। দোষীদের শাস্তির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার সরকারী আইন অনুযায়ী বিচার কার্য শুরু হয়েছে। "হত্যাকান্ড" প্রধান অভিযোগ রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

বারাসাতের ঘটনার পর সংবাদ মাধ্যম ধারাবাহিকভাবে ঘটনার রেশ, আদালত, পুলিশ, সি আই ডি এবং রাজনৈতিক মহলের সক্রিয় হস্তক্ষেপের বিবরণ পর্যায় ক্রমে প্রকাশের মাধ্যমে ঘটনার মূল কারণ, দিদির শ্লীলতাহানির প্রতিবাদের লঘুকরণ ঘটিয়েছে। এমনও কথা বারে বারে উঠে এসেছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে মরতে হবে। বাস্তব ঘটনাও তাই। "সার্জেন্ট বাপি সেন" থেকে শুরু করে "রাজীব দাস"– তারই উদাহরণ। তাই প্রতিবাদ কোরো না।

রাজীবের দিদি, ভাইয়ের খুনীদের সনাক্ত করেছে এবং এক খুনীর গালে চড় মেরেছে। ৩রা মার্চ এর "আনন্দবাজার" পত্রিকা – এই চড় মারার ঘটনা, পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় দিদি রিঙ্কু দাসের সহাস্য ছবি সহ ছেপে – কি বলতে চেয়েছে ? নারীর অপমান আর ভাই-এর হত্যার প্রতিশোধের পরিতৃপ্তি! নাকি এখানেই সমাপ্তি ?

এরূপ বহু "বর্তমান" চোখের সামনে দিয়ে ভাসতে ভাসতে হতাশার "অতীতে" হারিয়ে গেছে। সংবাদ মাধ্যম, সুকৌশলে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে, জনগণের পুঞ্জিভুত ক্ষোভের বাষ্পকে বের করে দিয়ে, ব্যবস্থার দায় - ঘটনাতে কেন্দ্রীভূত করে প্রচলিত ব্যবস্থাকে রক্ষা করে আসছে।

২০০৪ এর ১৪ই আগস্ট ধনঞ্জয়ের ফাঁসি - মহিলাদের শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, ইভটিজিং তথা নারী নিগ্রহ বন্ধ করবে (হ্রাস করবে) এমন ধারণা যাদের ছিল - তাদের ভ্রম হয়ত কেটে গেছে - অনেক আগেই। যারা দৈনিক খবরাখবর রাখেন, এধরণের দু চারটে খবর রোজই শুনতে পারেন। যদিও বেশিরভাগ খবরই সামাজিক নিয়মে চাপা পড়ে যায়।

মহিলাদের শ্লীলতাহানীর ঘটনা, ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু কেন ? পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর উপর পুরুষের একছত্র অধিকার। পুরুষের ভোগ্য নারী। তাই এ সমাজ শেখায় পুরুষের চারিত্রিক দোষটা স্বাভাবিক। কিন্তু পুরুষের এই দোষটি বাস্তবায়িত হয় কোন মহিলার উপর। মহিলার ক্ষেত্রে এটি সমাজ স্বীকৃত নয়। তাই স্বাভাবিকভাবে সমাজ বর্জিত হওয়ার ভয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী নিগ্রহের ঘটনা নারী নিজে ও পারিবারিকভাবে অপ্রকাশিত রাখতে চায়। আমাদের সমাজে এমন কোন মহিলা পাওয়া যাবে কি, যিনি একবারের জন্যও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা নিগৃহীত হন নি ?

কিন্তু এর শেষ কোথায় ? নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। নারী-পুরুষ মিলিতভাবে মানব প্রজাতি। যেখানে নারী-পুরুষ উভয়েই সম সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন যেখানে পুরুষ দ্বারা নারী অথবা নারী দ্বারা পুরুষ নিপীড়িত নয়, যেখানে কন্যা সন্তান-পুত্র সন্তান সমভাবে কাঙ্ক্ষিত, যেখানে লিঙ্গ ভেদটা শুধুমাত্র প্রজাতির অস্তিত্ব করার জন্য ব্যবহৃত - কিন্তু তা পাশবিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে, মানবিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত - সেখানে নারী ভোগ্য বস্তু নয়। সেখানেই নারী নিগ্রহের অবসান সম্ভব।■

বিজ্ঞান মনস্ক'র সদস্য হোন।
বিজ্ঞান আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন।

রিপোর্ট

বিজ্ঞান মনস্ক'র দুদিন ব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠান

২২-২৩শে জানুয়ারী ২০১১, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে এক লড়াইয়ের শপথ নিয়ে বিজ্ঞান মনস্ক কুসংস্কার বিরোধী ও গণ সচেতনতা বৃদ্ধিকারী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দক্ষিণ কলকাতার উপকণ্ঠে, ঠাকুরপুকুরের ব্রতচারী বিদ্যাশ্রমের রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চে ২২শে জানুয়ারী, 'বিজ্ঞান মানে কী' উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে এই সামগ্রিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মিহির প্রামাণিক বলেন যে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যে শুধুমাত্র একজন বিজ্ঞানী ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন একজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব; বিজ্ঞানী হিসাবে শুধু নয়, মানুষ হিসাবেও তিনি সমাজে তাঁর বিভিন্ন অবদান রেখে গেছেন।

এরপর পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কবিতা আবৃত্তি করে প্রতিযোগিতার জন্য। বিপ্লবী কবি, বিদ্রোহী কবি, প্রতিবাদী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কবিতার মাধ্যমে জরা জীর্ণ পিছিয়ে পড়া প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতিকে 'দেশলাই কাঠি'র আগুনে পুড়িয়ে প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন। সংগঠন প্রতিযোগিতার মত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দিতে নয়, জনসাধারণকে প্রচলিত ধারণা থেকে বিকল্প সংস্কৃতির, সহযোগিতার মাধ্যমে প্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এরপরে বিজ্ঞান মনস্কের কর্মীরা 'অলৌকিক নয় লৌকিক' শীর্ষক অসাধু, ভন্ড সাধু বাবাদের কারসাজি উন্মোচন করার প্রচেষ্টা করে এবং সমাজ জীবনে এই সকল কুসংস্কারের পিছনের মূল কারণ যে এই ব্যবস্থায় সকল মানুষের অনিশ্চয়তা ভরা জীবন তা তুলে ধরে। এরপরেই দেখানো হয় সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চলচ্চিত্র 'মহাপুরুষ', যা ভন্ডামীর মুখোশ উন্মোচনের সাথে, ভীষণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

এরপর 'জলসংকট কি ও কেন?' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান সময়ে জলসংকট যে শুধুমাত্র একটি মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবসার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে এবং এছাড়া এর পিছনে কোনো বিজ্ঞান সম্মত কারণ নেই তা ব্যাখ্যা করা হয়। বলা হয় সমুদ্রের নোনা জলকে মিঠা ও পানীয় জলে রূপান্তরিত করার নানাবিধ উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র মুনাফার লক্ষ্যেই সেগুলি ব্যবহৃত হয়। আলোচকরা বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে এই বক্তব্য তুলে ধরেন।

তারপর হয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। এতে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম।

এরপর তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের উপর অংশগ্রহণকারীরা সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সভা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

এই সকল অনুষ্ঠানের মাঝে (আগে-পিছে) চলে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা – প্রতিযোগী ছিলেন উপস্থিত সমস্ত দর্শক।

২২শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে আধুনিক গান পরিবেশনের মাধ্যমে।

২৩শে জানুয়ারী সকাল সাড়ে নটায় নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। 'কদম্ কদম্ বাড়ায়ে যা' গানের মাধ্যমে সভাস্থল নেতাজীর সময়ের উত্তাপকে অনুভব করে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরেই শুরু হয় ছোটদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা। সভাগৃহের বাইরের প্রাঙ্গনে বেশ কয়েকজন ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের উপস্থিতি সকলকে উৎসাহিত করে।

এর সাথে সাথেই অনুষ্ঠিত হয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। বেশ কয়েকজনের করা আবৃত্তি সভাস্থলে উপস্থিত সকলের মন জয় করে নেয়; এবং সভাস্থলে উপস্থিতির সংখ্যাও বাড়তে থাকে, যা বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মীদের ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে।

এরপরে খাদ্যে ভেজাল কি করে ধরা যায় তা হাতে কলমে দেখানো হয়। বলা হয়, খাদ্যে ভেজাল ধরার যে যে উপায়গুলি বলা হয়, তা যদি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করতে হয়, তাহলে প্রত্যেকের বাড়িতে ছোটো খাটো ল্যাবরেটরি বানাতে হবে। তাই প্রদর্শনকারীদের মাধ্যমে সংগঠনের পক্ষ থেকে ভেজাল বন্ধ করতে সরকার নির্ধারিত আইনগুলিকে বলবৎ করার জন্য সকলকে আন্দোলন করার আহ্বান জানানো হয়।

এর পরেই অনুষ্ঠিত হয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা। 'ধর্ম সমাজ প্রগতির অন্তরায় নয়' – এর পক্ষে ও বিপক্ষে বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী তাদের বক্তব্যকে সুচারুরূপে পরিবেশন করেন। যে কোন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতার মধ্য দিয়ে – সৃষ্টির সময় প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীলতার ডাক দিয়েই ধর্মের উদ্ভব হয় – আলোচনায় মূল দিক হিসেবে

তা উঠে আসে। কিন্তু সময় বদলেছে। মানুষ উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে কিন্তু ধর্ম কি তার প্রগতিশীল ভূমিকা রাখতে পেরেছে? সকল মানুষের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য এই বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হয়।

এরপরে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির দুজন প্রাক্তন সদস্য বিভিন্ন ধরণের সাপের প্রদর্শন করেন ও সাপ নিয়ে নানাবিধ তথ্য তুলে ধরেন। এই প্রদর্শনের মাধ্যমে যেমন ওঝা, গুণীনের বিরুদ্ধে সকল মানুষকে সজাগ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়, তেমনি বর্তমানে সকল হেল্‌থ সেন্টার তথা হাসপাতালে অ্যান্টিভেনাম সরবরাহ করার জন্য আওয়াজ তোলার কথা বলা হয় বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে।

এই অনুষ্ঠানের পরে অ্যানিম্যাল মাইগ্রেশনের উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারেরা কিভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয় তা দেখানো হয়।

এরপর শুরু হয় আলোচনা – 'জনসংখ্যা কি খাদ্য ও বেকার সমস্যার মূল কারণ?' শীর্ষক আলোচনা। বক্তারা বলেন যে, জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করার তত্ত্বের জনক হলেন ম্যালথাস। তিনি এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন ১৯শতকের গোড়ার দিকে। সে সময় মাথা পিছু যে গড় খাদ্য শষ্য উৎপাদিত হত বা মাথা পিছু খাদ্য শক্তি খরচ হতো, বর্তমানে তার পরিমাণ বেড়েছে অনেক গুণ এবং যদিও জনসংখ্যাও বেড়েছে কয়েক গুণ। সহজ পাটিগাণিতিক হিসাব কষলে ম্যালথাসের তত্ত্ব খারিজ হয়ে যায়। পরিশেষে বক্তারা বলেন যে জনসংখ্যা অভিশাপ নয় আশীর্বাদ। কিন্তু আজও অনাহার, বেকারত্ব সমাজে বিদ্যমান, কারণ এটা মুনাফাভিমুখী সমাজ ব্যবস্থা। তাই অনাহার, বেকারত্ব ঘোচাতে জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসাবে তুলে ধরা নয়, প্রয়োজন মুনাফা সর্বস্ব ব্যবস্থার পতন।

এই আলোচনার পরে একটি আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক দলের গান ও তৎসহ ছোটো ছোটো মেয়েদের নাচ দর্শকদের মন জয় করে নেয়।

একেবারে শেষে অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'বাংলা গানের পরিক্রমা'। অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গানের বিভিন্ন ধারাকে এই অনুষ্ঠানে নান্দনিকভাবে তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে, যেখানে 'কন্যা ভ্রূণ হত্যা একটি সামাজিক অপরাধ' এই শীর্ষকে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতারও পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান দেখে উপস্থিত দর্শকরা বিভিন্ন মতমত পেশ করেছেন। অনেকে বলেছেন এত অনুষ্ঠান একসাথে হওয়ায় সবকিছু মাথায় নেওয়া যায় নি। অনেকে বলেছেন সারাদিন ধরে অনুষ্ঠান হওয়ায় ব্যক্তিগত কাজের জন্য ইচ্ছে থাকলেও সব অনুষ্ঠান দেখতে পাননি। অনেকে বলেছেন বাচ্চাদের আকর্ষণ করার মত আরও বিষয় থাকার কথা। গানের অনুষ্ঠানগুলি ও কয়েকজনের করা আবৃত্তি প্রায় সকলের মন ভরিয়ে দিয়েছে। অনেকে বলেছে 'যে সাংস্কৃতিক পরিবেশে ছেলেমেয়েদের বড় করছি, এ যে তা থেকে এক ভিন্ন পরিবেশ'। 'জলসংকট' আলোচনায় একজন দর্শক খুশী হতে পারেন নি – তাঁর বক্তব্য জলসংকট একটা বাস্তব সমস্যা। অনেকে বলেছেন যে এই অনুষ্ঠান না দেখলে প্রগতিশীল সংস্কৃতি কি তা অজানাই থেকে যেত।■

রিপোর্ট

ত্রিপুরায় ভূমিকম্প বিষয়ক সেমিনার

বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় 'রেড ক্রস' সোসাইটি হলে "ভূমিকম্প মোকাবিলাঃ সমস্যা ও উত্তরণ" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০১১। আয়োজক ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ। ওই সেমিনারে আমাদের সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং একজন বক্তাসহ তিন জন প্রতিনিধি তাতে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারের শুরুতে আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয় "ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে পর পর ৩টি ভূমিকম্প ভবিষ্যতের বড় ধরণের বিপদের সংকেত মাত্র। এতে জনমানসে ভীতি ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তাই ভূমিকম্পের কারণ জেনে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেওয়া আজ এক জরুরী প্রশ্ন।" আমন্ত্রিত বক্তা অধ্যাপক মিহির দেব বলেন "ধর্মশাস্ত্রে লিখিত বা দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে প্রোথিত ধারণাগুলি আজ বিজ্ঞানের আবিষ্কার নস্যাৎ করেছে। ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব কি না আমার জানা নেই, তবে একসময় চীন ও জাপান থেকে এই বিষয় দাবী উঠেছিল। হয়ত একদিন ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস মানুষ দিতে পারবে তবে তার জন্য অনেক অজানা শর্তগুলি আবিষ্কার করার জন্য গবেষণা জরুরী। এখানে সেই গবেষণার সুযোগ ও সঙ্গতিপূর্ণ কাঠামো নেই। দুঃখের বিষয় এ রাজ্যে এখনও ভূবিজ্ঞান পঠন পাঠনের ব্যবস্থাই নেই।"

বিজ্ঞান মনস্কের প্রতিনিধি ভূমিকম্পের বৈজ্ঞানিক কারণ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন ও ভূআলোড়নই ভূমিকম্পের আসল কারণ। পৃথিবীর উপরিতল কতগুলি অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা, ভঙ্গুর এবং স্থিতিস্থাপক পদার্থ দিয়ে গঠিত। উপরের শিলামন্ডল এবং গুরুমন্ডলের উপরিস্তর নিয়ে এই স্তরটি গঠিত, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় লিথোস্ফিয়ারিক প্লেট বলে। এই প্লেটগুলি (মহাসাগরীয়, মহাদেশীয় অথবা আংশিক মহাসাগরীয় – আংশিক মহাদেশীয়) পরস্পর পরস্পরের সাথে জুড়ে থাকলেও তাদের প্রতিমুহূর্তে (একের তুলনায় অন্যের) সরণ হচ্ছে। এই প্লেটগুলির নীচের গরম, অর্ধতরল, অস্থিতিস্থাপক পদার্থের (যাকে বলে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার) মধ্যে যে প্রচন্ড তাপশক্তি তার পরিচলনের ফলে এবং প্লেটগুলির প্লবতার পার্থক্যের ফলে এই সরণ হয় প্লেট সীমানা বরাবর। তাই এই প্লেট সীমানা অঞ্চলগুলি প্রবল ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল। সরণের ফলে প্লেট সীমানার প্রস্তরখন্ডের উপর যে স্ট্রেস (বা চাপ) সৃষ্টি হয় তা যখন পদার্থের স্থিতিস্থাপক সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন প্রস্তর খন্ডের মধ্যে চ্যুতি ঘটে। এই কার্যের ফলে উৎপন্ন বিপুল শক্তি প্রস্তরখন্ডগুলির মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে, একের তুলনায় অন্য খন্ডকে হঠাৎ অনেকটা সরিয়ে দেয়। ভূমিকম্প জনিত তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠের উপরকার পর্বত, নদী, মাঠ ইত্যাদি এবং মানুষ সৃষ্ট স্থাপত্যকে ভেঙ্গে চুড়ে দেয়। শুধু প্লেট সীমানায় নয়, প্লেটের অভ্যন্তরস্থ ফাটলগুলিও প্লেটের এই সরণের ফলে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সেখানেও একইভাবে ভূমিকম্প হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর উপরিতলে এই চ্যুতিরেখা (বা ফল্ট লাইন)গুলি চিহ্নিত করে ওই চ্যুতিতলের দুপাশের প্রস্তরখন্ডের সরণের হার (যা আধুনিক স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সাহায্যে পরিমাপ যোগ্য) নির্ধারণ করেন, চ্যুতিতলের দুপাশের পদার্থের স্ট্রেসজনিত ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তনের হিসাব করেন এবং ভূমিকম্পের তরঙ্গ সম্পর্কে অতিসংবেদনশীল প্রাণীদের আচার আচরণ প্রত্যক্ষ করেন। নিরন্তরভাবে এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যেতে পারলে একই চ্যুতিতলে দুটি পর্যায়ক্রমিক ভূমিকম্পের মধ্যকার সময় সীমা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস করার এই বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী তো বটেই এমনকি স্বল্পমেয়াদী ভূমিকম্পের সময়কালও নির্ধারণ করা সম্ভব। অতীতে প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানে এর সফল প্রয়োগ করে আসন্ন বড়মাপের ভূমিকম্পের আগে মানুষকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বাঁচানো গেছে। গত সাত এর দশকে সমাজতান্ত্রিক চীন এ বিষয় সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছিল। আর আজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার এবং প্রযুক্তির আরও বিকাশ হয়েছে। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগালে আগামী দিনে মানুষ ভূমিকম্প মোকাবিলা করার বর্তমান সমস্যা সমাধান করতে পারবে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র যেহেতু পুঁজিবাদী

অর্থনীতির অনুসারী, পুঁজিনিবেশ করে সর্বাধিক মুনাফাই যেহেতু একমাত্র লক্ষ্য তাই চীন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা সহ সমস্ত রাষ্ট্রই ভূমিকম্পের পূর্বাভাস করার গবেষণা কার্যতঃ বন্ধ করে দিয়েছে। ভারত সরকার নিয়মিত প্রচার করছে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সম্ভব নয়, ভূমিকম্প নিরোধক বিল্ডিং নির্মাণই একমাত্র পথ।

ত্রিপুরা রাজ্যের বিষয় বলতে গিয়ে বক্তা বলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন মণিপুর রাজ্যে ভারতীয় প্লেট ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সীমানা অবস্থিত, এর নীচেই আবার ভারতীয় প্লেট এবং বর্মা (মায়ানমার) প্লেট সীমানা। ফলে এই অঞ্চল প্রচন্ড ভূমিকম্প প্রবণ। বিগত ভূমিকম্পের তথ্য অনুসারে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারতের সবচেয়ে ভূমিকম্প প্রবণ এবং বিশ্বের ষষ্ঠ ভুমিকম্প প্রবণ অঞ্চল বলা হয়। কিন্তু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। এই ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে সমস্ত সক্রিয় চ্যুতিতলগুলি চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। এই চ্যুতিতলগুলির সরণ এবং তার ফলে প্রস্তরখন্ডে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নিয়মিত পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। এই বিষয়ে এই অঞ্চলে গবেষণা যা হয়েছে তা না হওয়ার মত। গবেষণার বাস্তব কোন পরিকাঠামোই নেই এবং গবেষণার উপযুক্ত মানব সম্পদও নেই। দেশের সবচেয়ে ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও এ রাজ্যে ভূতত্ত্ব, ভূ-পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি পঠন-পাঠনের কোন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নেই, এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।

শুধুমাত্র পূর্বাভাসই নয়, আগামীদিনে ভূমিকম্পকে প্রতিরোধ করার বিজ্ঞানেরও অগ্রগতি হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে একটি সক্রিয় চ্যুতিতলের একটি অংশের (১½ কিমি. দৈর্ঘ্য) দুপাশে যদি ৫০০ মি. অন্তর তিনটি ছিদ্র তৈরী করে (অন্তত ৫ কিমি. গভীর) শেষ চারটি (দুপাশের ২টি করে) থেকে পাম্পের সাহায্যে সমস্ত তরল উত্তোলন করা হয় এবং মাঝের ২টি ছিদ্র দিয়ে পিচ্ছিল তরল পাম্প করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সময় অন্তর, তবে চ্যুতিতলের ওই অংশে (১½ কিমি.) যে স্ট্রেস সৃষ্টি তার জন্য ছোট মাপের চ্যুতি ঘটে ছোট মাপের ভূমিকম্প হবে। এইভাবে সময়ান্তর যদি এই প্রক্রিয়া লাগু করা যায় তবে একটি বড় মাপের (রিখটার স্কেলে ৬ বা তার অধিক মাত্রার) ভূমিকম্পকে ভেঙ্গে কয়েক হাজার ৪ মাত্রা, ৩ মাত্রা, ২ মাত্রা বা ১ মাত্রার ভূমিকম্পে বিভক্ত করা সম্ভব, যা মানব সভ্যতার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। উল্টে এই নিয়ন্ত্রিত ভূমিকম্প জনিত জিওথার্মাল এনার্জিকে ভবিষ্যতে মানব সভ্যতার পক্ষে ব্যবহার করা যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের উন্নত কয়েকটি দেশে এর পরীক্ষা সফল হলেও তার প্রচার হয়নি বা বিশ্বের কোন শাসকরাই এই গবেষণায় মদত দিতে উৎসাহী নয়।

এরপরে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডঃ সুদীপ দে তথ্যপূর্ণ স্লাইড শো-র মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে তিনি ও তাঁর ছাত্রদের অধ্যাবসয়ী গবেষণার প্রয়াস তুলে ধরেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন কিভাবে রিমোট সেন্সিং এবং ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টিভিটি পরীক্ষার মাধ্যমে তারা ত্রিপুরার চ্যুতিতলগুলির আবিষ্কার ও তার চরিত্র নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। তিনি বলেন যে উপযুক্ত বিজ্ঞানী, শিক্ষানবীশ, অর্থ ও পরিকাঠামোর অভাবে তাদের প্রয়াসে কিভাবে বাধা আসছে। এ বিষয় তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এই গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার দাবী জানান।

এরপর এন আই টি, আগরতলার অধ্যাপিকা শ্রীমতী লিপিকা হালদার তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ সুনির্দিষ্ট বক্তব্যে ভূমিকম্প প্রতিরোধের স্থাপত্য বিজ্ঞানকে একটি স্লাইড শো-র মাধ্যমে তুলে ধরেন। বড় বড় ভূমিকম্পে ভেঙ্গে পড়া বাড়িগুলির কোন অংশে দুর্বলতা থাকার জন্য এই ঘটনা ঘটছে তার সচিত্র ব্যাখ্যা দেন। ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষতঃ আগরতলার জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের বাড়িগুলি ভূমিকম্পের দৃষ্টিতে কি প্রচন্ড ভঙ্গুর অবস্থায় আছে তাও তিনি বিভিন্ন চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরেন। তিনি সরকারী ও বেসরকারী বিল্ডিংগুলি গড়ার সময় ভূমিকম্প প্রতিরোধী স্থাপত্য বিজ্ঞানকে কিভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে তাও চিত্রসহ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন।

সমাপ্তি ভাষণে ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চের বক্তা বলেন জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাপক মানুষের জীবনধারণের উন্নতি তথা সমাজ প্রগতি ঘটাতে পারছে কি না তা মিলিয়ে দেখা। ঘটনা দেখাচ্ছে যে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস, ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর মত কোন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বাস্তবতঃ কোন সরকারী উদ্যোগ নাই। এ বিষয় উপযুক্ত নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে জনবিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে তিনি শিক্ষক-গবেষক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। একমাত্র এভাবেই সেমিনারের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চের সদস্য, বিজ্ঞান মনস্কের প্রতিনিধিবৃন্দ, নাট্যভূমি গ্রুপ থিয়েটারের সদস্যগণ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিকগণ, ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ এবং শিক্ষক-অধ্যাপক-ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন।■

সাপের সাত কাহন

শ্রেয়া চক্রবর্তী

প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে বেশীরভাগ মানুষের মনে আজও সাপ সম্পর্কে এক অজানা ভয় প্রবলভাবে দেখা যায়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অভাবে মানুষের মনে সাপের কর্মকান্ড সম্পর্কে অজস্র আজগুবি ধারণা রয়েছে। এই রকম কয়েকটি ধারণার বাস্তবতা যাচাই করে দেখা যাক।

(১) সাপ নাকি রেগে গেলে শত্রুর পিছনে মাইলের পর মাইল তাড়া করে ছুটে যায়

প্রকৃতপক্ষে সাপ খুব ভীতু প্রকৃতির প্রাণী। বিরক্ত বা আক্রান্ত না হলে নিজে ছোবল মারে না বা আক্রমণ করে না। জলঢোঁড়া, কেউটে, গোখরো, দাঁড়াশ, শঙ্খচূড় ইত্যাদি রাগী সাপগুলি প্রচন্ড ক্ষিপ্রতায় কিছুদূর খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে আক্রমণ করে ঠিকই, কিন্তু এদের দৌড় বেশীদূর হয় না। সাপের খোলসে ঢাকা শরীরে ঘর্মগ্রন্থি না থাকায়, দেহের জলীয় পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে গরম শরীরে ঠান্ডা হওয়ার উপায় নাই। এছাড়া অধিকাংশ সাপের একটিমাত্র ফুসফুস – তাই দীর্ঘক্ষণ দ্রুত দৌড়বার জন্য প্রয়োজনীয় শ্বসনকার্য সম্ভব নয়। সাপের হৃদপিন্ডে তিনটি প্রকোষ্ঠ এবং সাপ শীতল-রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী - তাই রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি প্রয়োজন মত দ্রুত ও সাবলীল হতে পারে না। তাই শত্রুর পিছনে দীর্ঘক্ষণ তাড়া করা সাপের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সব কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাপ বেজি বা নেউলের কাছে পরাস্ত হয়।

(২) সাপ দুধ পান করে। অনেক সময় বলা হয় সাপ গরুর বাঁট থেকে সরাসরি দুধ পান করে

সাপের জীভ অত্যন্ত সরু ও চেরা, তালুর গঠন চুষে পান করার উপযুক্ত নয়। সাপ কোন তরল পদার্থই পান করতে পারে না। সাপুরেরা সাপকে, দুধ-কলা গিলিয়ে খাওয়ায়, সাপ নিজে থেকে পান করতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে, গোয়াল ঘরে কোন সাপ ঢুকলে তা গরুর পা জড়িয়ে ধরতে পারে এবং অনেক সময় সাপের মুখ গরুর বাঁটে লাগতে পারে – তবে তা দুধ পানের জন্য নয়।

(৩) কোন সাপকে আঘাত করলে, সাপ আঘাতকারীকে খুঁজে বার করে প্রতিশোধ নেয়

সাপের মস্তিষ্ক অত্যন্ত ছোটো, এর ওজন দেহের ওজনের অনুপাতে নগণ্য। বিবর্তনের ফলে সাপের দেহের গঠনগত অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু সেই অনুপাতে মস্তিষ্কের বিকাশ হয়েছে সবচেয়ে কম। স্মৃতি ধারণ করার ক্ষমতা সাপের মস্তিষ্কের নাই। কাজেই আঘাতকারীকে চিনে রেখে প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়টি সাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(৪) সাপুড়ে-বেদেরা বীন বাজায় এবং সেই সুরে উন্মত্ত হয়ে সাপ নাচে

বাস্তবে সাপের শ্রবনেন্দ্রিয় অকেজো। বহিকর্ণ তো নেই, উপরন্তু স্তনপায়ীদের মতো কানের পিন্না, ইয়ারড্রাম, ইউস্টিশিয়ান নল, টিম্প্যানিক গহ্বর এসব কিছুই সাপের নাই। অর্থাৎ সাপ কানে শুনতে পায় না। বাঁশি, হাত আর হাঁটুর দুলুনি সাপ তার ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। এই দেখার চেষ্টাতে সাপের মাথা যতটুকু নড়চড়া হয় তাকেই, সাপের নাচের কথা বলা হয়।

(৫) ময়াল, অজগর সাপেরা নিশ্বাসের মাধ্যমে টেনে নিয়ে শিকার করে

সাপের দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ ও স্থির। চোখের পাতা নেই। তাই শত্রু বা শিকারকে বুঝতে কষ্ট করে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে হয়। ময়াল, অজগরের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। নিথর, পাতাবিহীন বড় চোখের দিকে চেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় ইঁদুর, খরগোস জাতীয় প্রাণীগুলি। সেই সুযোগে অতি সন্তর্পণে শরীর টেনে নিয়ে হঠাৎ করে শিকার ধরে ফেলে।

(৬) দু-মুখো সাপের অস্তিত্ব আছে

কিছু কিছু প্রজাতির সাপ, যেমন ছোট ময়াল, বালি বোয়া বাংলা দেশের তুতুর সাপ, এদের শরীর গোল নলের মত এবং লেজ চ্যাপটা ও ভোঁতা – অবিকল মাথার মতন আকৃতি বিশিষ্ট। তাতেই লোকের ভ্রান্ত ধারণা। আবার কখনো কখনো এই সাপগুলি লেজ তুলে পিছু হটতে থাকে। এই ধরণের নানান পদ্ধতি মানুষের ভ্রান্ত ধারণাকে দৃঢ় করে।

(৭) পোষমানা সাপ

প্রথমেই বলা দরকার, অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মতন

সাপকে পোষ মানানো যায় না। কোন সাপ গৃহস্থের বসতিতে স্থায়ীভাবে থাকলে - তাকে বাস্তুসাপ বলা হয়। বাস্তু সাপ পোষ্য সাপ নয়। কোন গৃহস্থ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে, পোষ্য কুকুর, বিড়াল তার সঙ্গে চলে যায়। বাস্তু সাপের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটে না। সাপুড়েরা বিষধর সাপ নিয়ে নানা খেলা দেখায়, সেই সাপ সাধারণ কোনও মানুষ ধরতে গেলে ফোঁস করে ওঠে। এর থেকে পোষা সাপের ধারণাটা মনে গেঁথে গেছে। আসলে সাপ ধরা ও নাড়াচাড়া করার বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করলে সে আর ফোঁস করবে না।

(৮) **সাপের মাথার মণি**

সাপের মাথায় মণি মুক্তা সৃষ্টি হওয়ার মতন কোন রাসায়নিক পদার্থ সাপের শরীর থেকে নিঃসৃত হয় না। সাপের, অলঙ্কার বা প্রসাধনী দ্রব্য জোগাড় করে সাজগোজ করার স্বভাব নাই।

(৯) **সাপের শঙ্খলাগা**

সাপের শঙ্খ লাগা নিয়ে গ্রাম বাংলায় এমন একটা ধারণা আছে যে দাঁড়াশ সাপ মহিলা সাপ এবং কেউটে বা গোখরো পুরুষ সাপ। এই দুই বিপরীত লিঙ্গের সাপের মধ্যে শঙ্খ লাগে। শঙ্খ লাগা অর্থাৎ যৌন জনন দুটি বিপরীত লিঙ্গের কিন্তু একই প্রজাতির (Species) প্রাণীর ক্ষেত্রে ঘটে। দাঁড়াশ, কেউটে, গোখরো প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির সাপ। সুতরাং প্রচলিত ধারণাটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

(১০) **সাপ, মা মনসার বাহন**

পৌরাণিক কাহিনি, মনসামঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে, মা মনসার অভিশাপে, চাঁদ সদাগরের বংশ নির্বংশ করতে, মনসার বাহন সাপ এর (কালনাগিনীর) ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ। তাই সাপের হাত থেকে (কামড় থেকে) বাঁচতে মা মনসার পূজা দেওয়া উচিত।

বিষধর সাপের কামড় (থেকে) খেয়ে বাঁচার একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায় হল যথা সময়ে অ্যান্টিভেনাম চিকিৎসা শুরু করা। অ্যান্টিভেনামের অনুপস্থিতি, মা মনসার উপস্থিতির কারণ। ■

পাঠকের পাতা

সমীক্ষণ এ যুগের মাইল ফলক হয়ে দাঁড়াক !

এ ভাবেই মনে হয় ধীরে ধীরে রুখে দাঁড়ানো যায় সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়তো এক জীবনে এ ঘুনধরা সমাজ তথা মানুষকে আমুল পরিবর্তন করা যাবে না, তাই যুগের মাইল ফলক হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াক “সমীক্ষণ” বিজ্ঞান মনস্ক’র মুখপত্র, যা গণ হিস্টিরিয়া, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, জলসংকট ও সামাজিক ব্যক্তিত্বে শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র রায়-এর সম্বন্ধে নতুন রূপে আলোচনার মাধ্যমে সমাজ এক উজ্জ্বল আলোর পথে অনুরণনিত।

প্রভাবিত হয়ে লেখা

আমার জন্য তোর দু চোখে জল,
আমার জন্য তোর বুকেতে ব্যথা অবিরল ॥

আমার জন্য দিনে রাতে ঘুম আসে না তোর
কী হবে কী হবে দুশ্চিন্তাতে বিভোর।
আমার জন্য গভীর রাতেও দরজা খোলা রয়
খসে পড়ে যাওয়া উল্কার মতো মনে শুধু তোর ভয়।
আমার জন্য করবি কী তুই বল ॥

আমার জন্য জ্যোৎস্নার মতো ভালবাসা দিতে চাস
রামধনুরঙ নিস্তব্ধতে প্রতি ক্ষণে হারাস,
আমার জন্য অসহায় কেউ ভাটিয়ালী গান ধরে
রক্তের শ্রোতে উৎসার তুলে হাহাকার শুধু করে
আমার জন্য করবি কী তুই বল ॥

আমার জন্য চিল চোখের বাইরে নেইকো খাবার
ডাস্টবিন ঘেঁটে তাও খুঁজে দেখি সবই হয়েছে কাবার
আমার জন্য আমাকে যে রাখা নকলে প্রত্যয়িত
মূক বধিরতা, অন্ধ ঘোচাতে এ সমাজ লজ্জিত।
আমার জন্য করবি কী তুই বল ॥

অমরেন্দ্র নাথ বৈদ্য

খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল – কুফল ও গণসচেতনতা

পঞ্চানন মন্ডল

"ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই
ভেজাল সারা দেশটায়
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিষ
মিলবে না কো চেষ্টায়" – সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

'ভেজাল' কথাটির সাথে আমরা সকলেই অল্প বিস্তর পরিচিত। আমরা সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের সাথে ভেজাল নামক বিষ গ্রহণ করে চলেছি। প্রকৃতপক্ষে, এমন কোন বাজারী খাদ্যদ্রব্য আমাদের আহার তালিকায় নেই যাতে ভেজাল মেশানো হয় না। ভেজাল বা বিষ প্রয়োগে মানুষের শরীরে যে বিষক্রিয়া তৈরী হয় তা খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে হয় না বরং এর ক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদী। দীর্ঘদিন ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করতে করতে মানুষের শরীরের স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, সংবহন তন্ত্র ইত্যাদি বিকল হতে থাকে আর ডাক্তার, বদ্যি, হস্‌পিটাল, নার্সিং হোমের পকেট মোটা হতে থাকে, পাশাপাশি ওষুধ কোম্পানীগুলিও ফুলে ফেঁপে ওঠে।

সাধারণত ক্রেতার প্রত্যাশা বা চাহিদার সাথে খাদ্য দ্রব্যের গুণমানের সামঞ্জস্য না ঘটলেই সেই খাদ্য দ্রব্যকে আমরা ভেজাল খাদ্য হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

ভেজালের রকম-সকম ঃ

♦ ভালো জিনিষের সঙ্গে ক্ষতিকর নয় এমন সস্তা জিনিষ মিশিয়ে পরিমাণ বাড়ানো – যেমন, দুধে জল, মধুতে চিনি ইত্যাদি।

♦ একই রকম দেখতে এমন নকল জিনিষ ব্যবহার - যেমন সরিষার বীজের সঙ্গে শিয়াল কাঁটার বীজ (Argemone Seed), গোলমরীচের সঙ্গে পাকা পেঁপের বীজ ইত্যাদি।

♦ খাদ্য বস্তুর কোন উপাদান আংশিকভাবে বা পুরোপুরি বের করে নেওয়া - যেমন, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনির সুগন্ধি বের করে নেওয়া।

♦ খাদ্যের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য বা খাদ্যকে সুদৃশ্য করার জন্য ক্ষতিকর রঙের ব্যবহার - যেমন, অমৃত্তি, বোঁদেতে মেটানিল ইয়োলো, রাঙা আলুতে কঙ্গো রেড, সবুজ শাক সব্জিতে ম্যালাকাইট গ্রীন, মাছের কানাকোতে অরামিন ইত্যাদি।

♦ খাদ্যে ভেজাল লুকানোর জন্য অন্য কোন ক্ষতিকর জিনিষ ব্যবহার করা - যেমন দুধে জল মিশিয়ে ঘনত্ব ঠিক রাখার জন্য ইউরিয়া মেশানো।

♦ খাদ্যের পচন রোধ করার জন্য অত্যধিক রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন, সংরক্ষক, কীটনাশক, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি) ব্যবহার করা।

শুধুমাত্র ভারত নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ভেজালের চল রয়েছে। ভিক্টোরিয়ান যুগে ইংল্যান্ডে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হ'ত। জানা গেছে চীজ-এ (Cheese) রং করার জন্য সীসার যৌগ ব্যবহার করা হত। ১৮২০ সালে জার্মানীতে ফ্রেডরীক অ্যাকুন নামে এক ব্যক্তি ঐ দেশের উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যে ও পানীয়তে ভেজাল দ্রব্যের উপস্থিতি প্রমাণ করেন এবং জনমত গঠন করতে থাকেন। যার ফলে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহকারীরা অসন্তুষ্ট হয় এবং ঐ ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে রয়েল ইন্সটিটিউট লাইব্রেরীর (Royal Institute Library) বই ছেঁড়ার অভিযোগ এনে ফ্রেডরীকের ভেজালের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা ব্যাহত করা হয়। বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পায়নের তথা পুঁজিবাদী বিকাশের সময় থেকে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়াটা নিয়মে দাঁড়ায়। দেশে দেশে এর বিরুদ্ধে আইনও তৈরী হয়। কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকে। প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের উপস্থিতি প্রমাণ করেন এবং নিজে হাতে মানুষের সামনে তার পরীক্ষা করে দেখাতেন। আমাদের দেশেও ১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ভেজালকারীদের ল্যাম্পপোষ্টে বেঁধে পেটানোর কথা ঘোষণা করা হয়। Prevention of Adulteration Act' 1954 নামে আইন প্রণয়নও করা হয়। যাতে 'ভেজালকারী প্রমাণ হলে এক হাজার (১০০০) টাকা জরিমানা বা তিন মাসের কারাদন্ড'র কথা বলা আছে। সরকারী পরীক্ষাগারে খাদ্যে ভেজালের উপস্থিতি নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ভেজালকারীরা ভেজালদ্রব্যের পরিবর্তন ঘটাতে থাকে তাই ঐ পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে না ফলে তাদের ভেজালকারী হিসাবে প্রমাণও করা যায় না।

এখন আমরা দেখি, কোন খাদ্যে সাধারণত কি কি ভেজাল দেওয়া হয়, তার ক্ষতিকর দিকগুলি কি কি এবং তা পরীক্ষা করার কিছু পদ্ধতি ঃ

খাদ্যদ্রব্য	কি ভেজাল থাকে	ক্ষতিকারক দিক	কিভাবে জানবো - তার পরীক্ষা
দুধ	জল	দুধের তারল্য বৃদ্ধি পায় ফলে শিশুদের উদরাময় (diarrhoea) হবার সম্ভাবনা।	কোন মসৃণ তলে এক ফোঁটা দুধ রাখলে যদি দেখা যায় জলীয় অংশ পাশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং ঐ তলকে আনত করলে দুধের গড়িয়ে পড়া রেখা শুঁকিয়ে গেলে তা সাদা না হয় - তবে বুঝতে হবে দুধে জল মেশানো রয়েছে। বিশুদ্ধ দুধে তা হবে না।
	ইউরিয়া	বুক্কের স্বাভাবিক কার্য্য ক্ষমতা হ্রাস পায়	৫ মিলি দুধে দুই ফোঁটা ব্রোমো থাইমল ব্লু দ্রবণ দিয়ে ১০ মিনিট রাখলে তা নীল বর্ণ ধারণ করে।
সরিষা বীজ	শিয়ালকাঁটার বীজ	ড্রপসি, গ্লুকোমা, কার্ডিয়াক অ্যারেষ্ট	শিয়ালকাঁটার বীজত্বক (Seed Coat) অমসৃণ কিন্তু সরিষার বীজত্বক মসৃণ। শিয়ালকাঁটার বীজ চাপ দিলে ভিতর থেকে সাদা অংশ বেরিয়ে আসে কিন্তু সরিষার বীজের ভিতরের অংশ হলুদ।
সরিষার তেল	শিয়ালকাঁটার বীজের তেল	ড্রপসি, গ্লুকোমা কার্ডিয়াক অ্যারেষ্ট	৩ মিলি তেল একটি পরীক্ষা নলে নিয়ে ২০ ফোঁটা গাড় নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে তিন মিনিট ফোটালে নীচের দিকে লাল রঙের অধঃক্ষেপ পড়বে।
গোলমরীচ	পাকা পেঁপের বীজ	সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি করেনা।	একটি কাঁচের বাটিতে অ্যালকোহল নিয়ে গোলমরীচের বেশ কিছু বীজ ছেড়ে দিলে পেঁপের বীজ ভেসে থাকবে কিন্তু গোলমরীচের দানাগুলি ডুবে যাবে।
চা	রঙিনপাতা	যকৃতের রোগ, ক্যান্সারের সম্ভাবনা	সাদা কাগজে চা পাতা ঘসলে কাগজে রঙ লেগে যাবে।
	ব্যবহৃত চা-পাতা	সাধারণত স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না।	ভিজে ফিল্টার পেপারের উপর চা পাতা ছড়িয়ে দিলে ফিল্টার কাগজে চায়ের দাগ লাগবে। পরিষ্কার ঠান্ডা জলে চা পাতা দিলে জল কিছুক্ষণ পর চায়ের রঙ নেবে।
মধু	জল	জল মেশালে মধু নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যা খেলে পেটের গোলযোগ হতে পারে।	একটি কাঠিতে তুলো বেঁধে মধু লাগিয়ে আগুনের শিখাতে ধরলে জ্বলবে কিন্তু জল মেশানো থাকলে চিক্-চিক্ শব্দ হবে।
	চিনি	পাকস্থলির রোগ	৫ মিলি মধুতে ৫ মিলি ইথার মিশিয়ে ঝাঁকিয়ে একটি পাত্রে ঢেলে ফুঁ দিয়ে ইথারকে পুরোপুরি বাষ্পীভূত করতে হবে। এখন অবশিষ্টের উপর ২-৩ মিলি রিসরসিনল ঢালতে হবে। মধুতে চিনি থাকলে দ্রবণ গাঢ় নীল বর্ণ ধারণ করবে।
আটা	গুঁড়ো বালি বা ধূলো	আন্ত্রিক গোলযোগ	সামান্য আটা পরীক্ষানলে নিয়ে ১০ মিলি কার্বনটেট্রা ক্লোরাইড (CCl_4) মিশিয়ে ঝাঁকানো হল। এখন পরীক্ষা নলকে স্থিরভাবে কিছুক্ষণ রাখলে বালি, ধূলো নীচে থিতিয়ে পড়বে।
	চকের গুঁড়ো	আন্ত্রিক গোলযোগ	সামান্য আটা পরীক্ষা নলে নিয়ে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) যোগ করে ঝাঁকালে বুদবুদ সৃষ্টি হবে।
কালোজিরা	চারকোলের গুঁড়ো দিয়ে রং করা ঘাসের বীজ	পেটের গোলযোগ	সাদা কাগজের উপর কালোজিরা ঘসলে যদি কালো দাগ লেগে যায় তবে তা চারকোল দিয়ে কালো রং করা ঘাসের বীজ।
হিং	মাটির কণা বা ধূলো	ধূলিকণায় থাকা জীবাণু থেকে বিভিন্ন রোগের সম্ভাবনা	হিং জলে দ্রবীভূত করলে ধূলিকনা, বালি নীচে থিতিয়ে পড়বে।

খাদ্যদ্রব্য	কি ভেজাল থাকে	ক্ষতিকারক দিক	কিভাবে জানবো - তার পরীক্ষা
খাদ্য লবণ	সাদা পাথরের গুঁড়ো	পেটের গোলযোগ	জলে খাদ্য লবণ সম্পুর্ণ গুলে যাবে। পাথরের গুঁড়ো নিচে থিতিয়ে যাবে।
ধনে গুঁড়ো	ঘুঁটের গুঁড়ো	অস্বাস্থ্যকর	জলে ভিজিয়ে রাখলে ঘুঁটের গুঁড়ো জলে ভাসবে ও গোবরের বাজে গন্ধ ছাড়বে।
আইসক্রিম	কাপড় কাচার সোডা	পরিপাক সমস্যা	আইসক্রিমে সামান্য লেবুর রস দিলে বুদবুদ সৃষ্টি হয়।
বেসন	খেসারির ডালের বেসন	ল্যাথাইরিজম (এক ধরণের পক্ষা-ঘাত), ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা	সামান্য বেসন একটি কাঁচের পাত্রে নিয়ে ৫০ মিলি লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করে ১৫ মিনিট রাখা হল। যদি গোলাপি রং দেখা যায় তবে তা খেসারির ডালের বেসন।
ঘি বা মাখন	বনস্পতি ঘি	সাধারণভাবে ক্ষতিকর নয়	পরীক্ষা নলে এক চামচ গলিত ঘি বা মাখন নিয়ে, সম পরিমাণ লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে এক চিমটে চিনি যোগ করে এক মিনিট ঝাঁকাতে হবে। এখন পরীক্ষানলকে ৫ মিনিট স্থিরভাবে রাখলে নীচের দিকে লালচে রং দেখা যাবে।
	পেষাই করা মিষ্টি আলু	ঐ	৫ মিলি ঘি বা মাখন একটা পরীক্ষানলে নিয়ে ফোটানো হল। তারপর ঠান্ডা করে তাতে এক ফোঁটা আয়োডিন দ্রবণ যোগ করলে নীল রং ধারণ করে।

খাদ্যদ্রব্যে রঙের ব্যবহার ও তার ক্ষতিকারক দিক

ক্ষতিকারক রং	কোন কোন খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত হয়	ক্ষতিকারক দিক	কিভাবে জানবো - তার পরীক্ষা
মেটানিল ইয়োলো(হলুদ)	অমৃত্তি, বোঁদে, লাড্ডু, বিভিন্ন প্রকার ডাল, গুঁড়ো হলুদ, বিরিয়ানী ঘুগনী ইত্যাদি	পাকস্থলী প্রদাহ, অন্ডকোষে সংক্রমণ এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে।	খাবারে কয়েক ফোঁটা লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড / মিউরিটিক অ্যাসিড দিলে সঙ্গে সঙ্গে বেগুনী রং ধারণ করবে।
রেড কঙ্গো (লাল)	রাঙা আলু, লাল বোঁদে, শুকনো লংকা ইত্যাদি।	মূত্রাশয় ও বৃক্কে সংক্রমণ, টিউমার ইত্যাদি।	সামান্য তুলো তরল প্যারাফিনে (এক প্রকার মোম) ভিজিয়ে খাবারের গায়ে ঘষলে তুলো লাল হয়ে যাবে।
রোডামিন-বি (গোলাপী)	ফ্রুজ, লজেন্স, জেলি, জ্যাম, সস্, স্কোয়াশ ইত্যাদি।	বৃক্ক, যকৃৎ ও প্লীহার বিভিন্ন রোগ হতে পারে।	খাবারটিকে জলে গুলে রোদে ধরলে আলোর বিচ্ছুরণ হবে। খাবারের টুকরো কাঁচের বাটিতে নিয়ে তার মধ্যে কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড (CCl_4) মিশিয়ে ঝাঁকালে গোলাপী রং অদৃশ্য হয়ে যাবে। ঐ মিশ্রণে সামান্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে পুনরায় রং ফিরে আসবে।
ম্যালকাইট গ্রীন (সবুজ)	সবুজ সজী, ব্রকোলি, মটরশুটি, করলা।	ফুসফুস সংক্রমণ, বিভিন্ন রকম ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে।	সামান্য তুলো তরল প্যারাফিনে ভিজিয়ে খাবারের গায়ে ঘষলে, তুলো সবুজ হয়ে যাবে।
অরামিন (লাল)	মাছের কানকো, বাসি মাংস।	শ্বাসকষ্ট, পেটে ব্যথা	পরিষ্কার জলে ধুলে জল লাল হয়ে যাবে।

ভেজালকারীরা কেন খাদ্যে ভেজাল দেয়

এর একমাত্র কারণ মুনাফা। অধিক মুনাফার তাড়নায় ভেজালকারীরা খাদ্যে ভেজাল মেশায় এটা জেনেই যে সে মানুষের ক্ষতি করছে। সে এটাও জানে যে সে নিজেও ভেজালের শিকার। যে ভেজালকারী সরিষার তেলে বিষ মেশায় সে নিজেও জানে যে তার ছোট বাচ্চাটিকে সে ভেজাল দুধ খাওয়াচ্ছে। আসলে এটা একটা জাল, যে জালে সমাজের সমস্ত মানুষই আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ে আছে। এই জাল থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি ? এই জাল আসলে অর্থনৈতিক জাল - মুনাফালোভী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক জাল। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া এ জাল থেকে মানুষের মুক্তি নেই। একজন গরীব গোয়ালাকে বা ছোট আনাজ বিক্রেতাকে ধরে শাস্তি দিলেই এই সমস্যার সমাধান হবে না।

এর জন্য চাই সচেতনতা বৃদ্ধিকারী আন্দোলন। পঞ্চায়েত, পৌরসভা বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং এর প্রতিকার করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে। ■

খাদ্য সংকট ও বেকারত্বের কারণ কি জনসংখ্যা বৃদ্ধি?

বহুদিন ধরে অধিকাংশ শিক্ষিত অবস্থাপন্ন মানুষ মনে করেন খাদ্য ও বেকার সমস্যার প্রধান ও একমাত্র কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধিকে বুঝানোর জন্য, জনবিস্ফোরণ শব্দটা বাজারে চালু করা হয়েছে। বেকার সমস্যা ও খাদ্য সমস্যার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই প্রধান কারণ রূপে চিহ্নিত করেন **থমাস রবার্ট ম্যালথাস**। ১৭৯৮ থেকে ১৮২৬ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ও পর্যায়ক্রমে ম্যালথাস তার এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। তাঁর লিখিত, "An Essay On The Principle Of Population" – তিনি ছয় বার সংস্কার করেন। ঐতিহাসিকভাবে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন যে, যে কোন সমাজ ব্যবস্থাতেই, এমনকি সেই সমাজ ব্যবস্থা যতই অধার্মিক বা যতই অনৈতিক হোক না কেন, নৈতিকতার প্রবণতা এতই প্রবল থাকে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা সব সময়ই ধ্রুবক রূপে কাজ করে। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সমাজের নিম্নশ্রেণীর অবস্থা দুর্দশাপূর্ণ করে তোলে এবং তাঁদের অবস্থার স্থায়ী উন্নতিতে বাধা দেয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু মানুষের এককালীন অকাল মৃত্যু বারে বারে পৃথিবীতে জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করেছে। তিনি, অষ্টাদশ শতাব্দীর খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির মতবাদকে কাল্পনিক বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন এবং জনসংখ্যা হ্রাস করেই উৎপাদিত খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে সমতা রক্ষা করার কথা বলেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক জীববিদ **চার্লস ডারউইন ও অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালস**, ম্যালথাসের মতকে, প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের বৌদ্ধিক ব্যবহারিক প্রয়োগের পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে –

(১) খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ মাথা পিছু হ্রাস পায়।

(২) বাজারে কাজের অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক উদ্বৃত্ত থাকায় মজুরী হ্রাস পায়।

(৩) বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান কম থাকায় দ্রব্যমূল্য (বাজার দর) বৃদ্ধি পায়।

(৪) সংসার চালানোর জন্য, পূর্বের ন্যায় উপার্জন করার জন্য শ্রমিককে বেশি সময় কাজ করতে হয়।

(৫) সমাজে এক দুর্দশাময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। অবস্থা সামাল দিতে কৃষককে অতিরিক্ত জমি চাষ করতে হয় এবং জমিতে সার ব্যবহার করতে হয়। সমাজে নিম্নশ্রেণীর অবস্থা দিনে দিনে করুণ থেকে করুণতর হয়।

তাঁর মতে এই দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য জনসংখ্যাকে বলপূর্বক একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরে রাখা দরকার। প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যদিয়ে চেতনার জাগরণ হলে মানুষ বুঝতে পারবে অধিক জনসংখ্যা সম্পদের বন্টনে বিঘ্ন ঘটায়। মহামারি, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধও জনসংখ্যা হ্রাস করার একটি উল্লেখযোগ্য ফ্যাক্টর। যুদ্ধেও বহু **অকাল মৃত্যু** ঘটে - যা জনসংখ্যা হ্রাসের সহায়ক।

সম্পদের সাথে জনসংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার তিনি দুটি উপায় উল্লেখ করেন –

(১) পজিটিভ চেক্ – মৃত্যু হার বৃদ্ধি করে। মৃত্যু হার বৃদ্ধির জন্য অভুক্ত থাকা, রোগবৃদ্ধি ও যুদ্ধের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন।

(২) প্রতিরোধমূলক - জন্মহার হ্রাস করা। জন্মহার হ্রাস করার জন্য ভ্রূণহত্যা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, বেশ্যাবৃত্তি, বিবাহ থেকে বিরত থেকে চিরকুমার থাকার শপথ নেওয়া।

তিনি আরো বলেন, আর্থিকভাবে ত্রাণ পাবার যোগ্য লোকদের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে হ্রাস করা দরকার।

কার্ল মার্কস বলেছিলেন, মানুষের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার ক্ষমতা সম্পর্কে ম্যালথাসের কোন ধারণা ছিল না।

শুধু ম্যালথাস নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন সময়, অর্থনীতিবিদ-দার্শনিকরা জনসংখ্যাকে রাষ্ট্রের দারিদ্র ও বেকারত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর রূপে বর্ণনা করেছেন। তাই প্রয়োজনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস-এর পরিকল্পনা সরকারগুলির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল ও প্লুটো, জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দারিদ্রের কারণ রূপে ব্যাখ্যা করেন।

চীনা লেখক কনফুসিয়াসের (৫৫১-৪৭৮ বিসি) মতে অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনগণের ভাগে সম্পদ হ্রাস করে যা পরস্পরের মধ্যে বিবাদের কারণ রূপে বিরাজ করে। খাদ্য সরবরাহ মাথা পিছু হ্রাস পেলে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়।

৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতীয় রাজনৈতিক দার্শনিক কৌটিল্য জনসংখ্যাকে – রাজনীতি, অর্থনীতি ও সেনাবাহিনীর শক্তি রূপে ব্যাখ্যা করেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশে তিনি বিধবা

বিবাহের পক্ষে ছিলেন।

প্রাচীন রোমে (৬৩ বিসি - ১৪ এডি) রোম সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্য জনবলের প্রয়োজন থাকায় সরকারীভাবে বাল্য বিবাহ আইনসিদ্ধ ও উৎসাহযোগ্য করা হয়েছিল। শিশু জন্মহার বৃদ্ধির জন্য সরকারীভাবে আহ্বান রাখা হয়েছিল। লেক্স জুলিয়া (১৮ বিসি) ও লেক্স পাপিয়া পোপ্পাইয়া (৯ এ ডি) আইন দ্বারা অধিক সন্তান এর জন্মদানের জন্য কর মুকুব করতেন এবং যে দম্পতি নিঃসন্তান থাকতেন শাস্তি স্বরূপ তাদের মৃত্যুদন্ড প্রদান করতেন।

খ্রীষ্টান লেখক, টারটুলিন (১৬০-২২০ এডি) সর্বপ্রথম, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধকে জনসংখ্যা হ্রাসের কৃত্রিম উপায় বলে ব্যাখ্যা করেন।

থমাস সোওয়েল এবং ওয়ালটার-ই-উইলিয়াম এর মতে দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ ঘটে, অপদার্থ সরকার ও অনুপযুক্ত অর্থনৈতিক প্রকল্পর জন্য, অধিক জনসংখ্যার জন্য নয়।

অর্থনীতিবিদ জুলিন সাইমন-এর মতে উচ্চ জনঘনত্ব মানব জাতিকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং কারিগরী বিদ্যায় উন্নতির দিকে পরিচালিত করে - যা মানব জীবন ধারণের মানকে উন্নততর করে। তার দাবী মানবজাতিই আসলে অফুরন্ত সম্পদ - কারণ মানবজাতির উদ্ভাবনীশক্তি ও সৃষ্টিশীলতা সকল সমস্যাকে ভবিষ্যতে দূর করতে পারবে। তিনি আরো দাবী করেন যে, সমগ্র মানব প্রজাতি অধিকতর আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায় উন্নিত হতে পারবে, পরিমাপযোগ্য বাস্তব পদ্ধতিতেই। তাঁর মতে, জনঘনত্বের নিরিখে পর্যায়ক্রমে দেশগুলির তালিকা তৈরী করলে দেখা যাবে যে জনঘনত্বের সঙ্গে দারিদ্র, দুর্ভিক্ষের কোন সম্পর্ক নাই। বরঞ্চ সরকারী দুর্নীতির মাত্রানুযায়ী, পর্যায়ক্রমে দেশগুলির তালিকা তৈরী করলে দেখা যাবে সরকারী দুর্নীতির সহিত দেশের দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯৬৮ সালে গারেট হার্ডিন এর বক্তব্য অনুযায়ী সমাজে সাধারণের দুর্দশা পরিত্যাগ করা যেতে পারে, দমনমূলকভাবে, জন্মদানের অধিকার হরণ করার মাধ্যমে।

মালথাসের বক্তব্য অনুযায়ী পৃথিবীর মোট সম্পদ ধ্রুবক। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রত্যেকের ভাগে সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পায়। মানব সভ্যতার সূচনায়, যে দিন থেকে মানুষ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য শুধুমাত্র প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ না করে, কৃষির মাধ্যমে উৎপাদন করতে শুরু করেছে - তা যতই অনুন্নত হোক না কেন - সেদিন থেকে মানুষ পশু থেকে আলাদা হতে শুরু করেছে। ক্রমে মানুষ তার প্রয়োজনীয় সম্পদ শ্রমের দ্বারা হাতিয়ারের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে। যতই হাতিয়ারের উন্নতি ঘটেছে ততই সম্পদ (উৎপাদন) সৃষ্টি বেড়ে চলেছে।

আবার যে দিন থেকে একজন মানুষ তার প্রয়োজনের থেকে বেশি খাদ্যশষ্য উৎপাদন করতে পেরেছে - সেদিন থেকে মানব সভ্যতায় নতুন নতুন উৎপাদন ক্ষেত্র ও তৎসংলগ্ন শ্রেণীর (কুমোর, কামার, তাঁতি ইত্যাদির) আবির্ভাব ঘটেছে। বহুদিন যাবৎ মানব জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি (সম্পদ) কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্প কারখানা – অর্থাৎ প্রতিটি উৎপাদন ক্ষেত্রে মানব শ্রম দ্বারা উৎপাদিত হচ্ছে। যন্ত্রের আবিষ্কার ও বিকাশ এই উৎপাদনকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও তার প্রয়োগে (জীন প্রযুক্তি) কৃষি ক্ষেত্র থেকে শিল্প কারখানায় প্রতিদিনই প্রায় তার আগের দিনের উৎপাদনকে ছাপিয়ে নতুন নতুন রেকর্ড ভাঙ্গা-গড়া চলেছে।

গত শতাব্দীর ছয়-এর দশকের সূচনা থেকে নয় দশকের শেষ পর্যায় পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৪%। তথাপি দৈনিক মাথা পিছু খাদ্য উৎপাদন এতটাই বেড়েছে যে, পূর্বে যেখানে প্রত্যেকে দৈনিক ২৩১০ ক্যালরির খাদ্য পেতে পারত, নয় দশকের শেষভাগে সেটা দাঁড়ায় ২৮০৩ ক্যালারি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মাথা পিছু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পূর্বাপেক্ষা ২১.৩% ক্যালারি/দিন বৃদ্ধি পেয়েছে যার মধ্যে ৩০.৫% প্রাণীজ ও ১৯.৭৯% উদ্ভিজ্জ। গৃহপালিত জীবজন্তু ও রান্নার জন্য কিছুটা নষ্ট হলেও গড়ে মাথা পিছু ২৬২০ ক্যালরি/দিন অপেক্ষা কম নয়।

কোন প্রকার খাদ্য থেকে কতটা শক্তি পাওয়া যায়

(গড় হিসাব)

	সমগ্র বিশ্ব	উন্নয়নশীল দেশে	উন্নত দেশে
প্রোটিন থেকে	১০.৫%	৯.৭%	১২.১০%
ফ্যাট থেকে	২৩.০০%	২০%	৩২%
কার্বোহাইড্রেড এবং অ্যালকোহল থেকে	৬৬.৫%	৭০.৩০%	৫৫.৯০%

যদি সুষ্ঠভাবে বন্টন ও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তবে মাথা পিছু ২৬২০ ক্যালরি/দিন সুস্থ-সবল কর্মক্ষম থাকার জন্য প্রত্যেকের পক্ষে যথেষ্ট। অপুষ্টির কোন সম্ভাবনাই থাকে না। উন্নত দেশগুলিতে খাদ্য উৎপাদন যে মাত্রায় পৌঁছেছে তা গড়ে দৈনিক মাথা পিছু ৩২৩০ ক্যালরি শক্তি যোগানোর সমতুল্য। বিভিন্ন প্রকার নষ্টকে হিসাবের মধ্যে আনলেও এর মান ২৮৪২ ক্যালরি/দিন/মাথাপিছু এর নীচে নামে না। কয়েকটি দেশে এর মান মাথাপিছু ৩৬৫০ - ৩৭৫০ ক্যালরি/দিন।

ঐ একই সময়ে উন্নয়নশীল (১৯৬০-১৯৯০-এর শেষ) দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৯% তথাপি দৈনিক মাথা পিছু ৩৪.১% শক্তির যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার মতন খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন হচ্ছে। এই সময়সীমার সূচনায় খাদ্য থেকে মাথা পিছু দৈনিক প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ ছিল ১৯৯৭ ক্যালরি, সময়সীমার শেষ পর্যায় তা দাঁড়ায় ২৬৭৮ ক্যালরি। পরিসংখ্যান থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ম্যালথাসের তত্ত্বের সহজ পাটিগনিতীয় ব্যাখ্যাটির প্রয়োজনীয় শর্তের [সম্পদ ধ্রুবক] বাস্তব ভিত্তি নাই।

রাষ্ট্রসংঘ, সি আই এ, এফ এ ও প্রভৃতির তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে জন্মের হার পূর্বাপেক্ষা অনেক কমে গেছে। কিন্তু জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। তার কারণ মৃত্যুর হারও অনেক কমে গেছে। মৃত্যুর হার কমার মূল কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি ও তার প্রয়োগ। এর ফলে শিশু মৃত্যু, অকাল মৃত্যু হ্রাস পেয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ঘটনা, যুদ্ধ যে মাত্রায় অপরিণত মৃত্যু ঘটাতে পারত - তা অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা।

ভারতে জন্ম হার / মৃত্যু হার

	জন্ম হার	মৃত্যু হার	পার্থক্য
১৯০১-১৯১০	৪৯.২	৪২.৬	৬.৬
২০১০	৭.৫	৬.২৩	০.২৭

এনসাইক্লোপিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, জানুয়ারী ২০১১-তে

সারা বিশ্বে জনসংখ্যা	**৬৮৯,৩২,৪৭,৩০০ জন**
সারা বিশ্বে মহাদেশীয় স্থল ভাগ	**১৪,৮৯,৪০,০০০ বর্গ কিমি.**
সারা বিশ্বে জনঘনত্ব	**৪৬ জন / বর্গ কিমি.**

খাদ্য থেকে শক্তির উৎস

		সমগ্র পৃথিবী	উন্নয়নশীল দেশগুলিতে	উন্নত দেশগুলিতে
১৯৬০-এর দশকের সূচনায়	প্রাণীজ প্রোটিন	৮৭	৩৯	১৮৯
	উদ্ভিজ প্রোটিন	১৫৫	১৫০	১৬৭
	প্রোটিন	**২৪২**	**১৮৯**	**৩৫৬**
	স্যাচুরেটেড ফ্যাট	১৭৪	৯৯	৩৪৩
	মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট	১৬০	৯৩	৩০৯
	পলি আন স্যাচুরেটেড ”	১০৬	৭২	১৬০
	ফ্যাট	**৪৪০**	**২৬৪**	**৮১২**
	স্টার্চ	১২৬৭	১৩২২	১১৫৩
	সুগার	৩০৮	২০৬	৫৪০
	অ্যালকোহল	৫৩	১৬	১৩৭
	কার্বোহাইড্রেড	**১৬২৮**	**১৫৪৪**	**১৮৩০**
১৯৯০-এর দশকের শেষে	প্রাণীজ প্রোটিন	১১৯	৮৫	২৩৭
	উদ্ভিজ প্রোটিন	১৭০	১৭৬	১৫৫
	প্রোটিন	**২৮৪**	**২৬১**	**৩৯২**
	স্যাচুরেটেড ফ্যাট	২৩১	১৮৯	৩৬৯
	মনো আন স্যা. ফ্যাট	২৪৬	২০৩	৪১২
	পলি আন স্যা. ফ্যাট	১৬৭	১৪২	২৫১
	ফ্যাট	**৬৪৪**	**৫৩৪**	**১০৩২**
	স্টার্চ	১৪১৭	১৫১৩	১০৫৭
	সুগার	৩৮৬	৩২৬	৬০৩
	অ্যালকোহল	৬৭	৪৪	১৪৫
	কার্বোহাইড্রেড	**১৮৭০**	**১৮৮৩**	**১৮০৫**

বর্তমানে, আন্তর্জাতিকভাবে জনসংখ্যা হ্রাসের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে তা নানারূপে লাগু আছে। তারই নীতি অনুযায়ী, আমাদের দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য “পরিবার পরিকল্পনা” প্রকল্পটি লাগু আছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী একটি দম্পতির দুটির বেশি সন্তান হওয়া উচিৎ নয়। আমাদের দেশের মতন দেশগুলি, সামাজিক রীতি (সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি) অনুযায়ী সন্তান

ধারণের ক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন গুরুত্ব ছিল না, নারীকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র রূপে বিবেচনা করা হত। "পরিবার-পরিকল্পনা" প্রকল্পটি লাগু হওয়ায়, সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা - মানব অধিকারের একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়েছে।

কিন্তু আমাদের সামনে যে চিত্রটা বিদ্যমান তা হল আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারগুলিতে সন্তান সংখ্যা একটি বা দুটি। আর যে সব পরিবারের আয় প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম, সেই পরিবারগুলিতে সন্তান সংখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই এর অধিক। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির শিশুরা পারিবারিক আয়-এর সহায়ক হবার জন্য শৈশব থেকে বাবা-মা এর সঙ্গে অথবা এককভাবে কাজে যুক্ত হয়। চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশু মৃত্যুর হার কমে গেলেও - শিশুদের সরকারি টিকাকরণ ব্যতীত সকল চিকিৎসাই টাকা দিয়ে কিনতে হয়। তাই আর্থিকভাবে পিছিয়ে পরা পরিবারগুলি, চিকিৎসার অভাবে সন্তানহীন হবার আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেতেও বহু সন্তান ধারণ করে। আধুনিক চিকিৎসার আগমনের পূর্বে রাজা থেকে প্রজা প্রত্যেকের পরিবারেই সন্তান সংখ্যা ছিল বহু।

প্রচলিত সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে মানব প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ব্যক্তিগতভাবে বা পারিবারিকভাবে সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত সমস্যার ভ্রূণ যে সামাজিক সমস্যার মধ্যেই নিহিত থাকে - তা সে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করার পথ সে বেছে নেয়। কিন্তু বিকাশের সামাজিক রীতিটি হল স্ত্রীকে স্বামীর বাড়ীতে বসবাস করতে হয় এবং তাদের পুত্র সন্তান স্বামীর বংশের ধারক ও বাহক রূপে বিবেচিত হয়। আবার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সরকারী নিরাপত্তাহীনতাই নিয়ম। তাই বংশ রক্ষার উদ্দেশ্য হল বৃদ্ধ বয়সে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব দূর করা এবং সামাজিক সমস্যার ব্যক্তিগতভাবে সমাধান করার জন্য সঞ্চিত সম্পত্তির উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য উত্তরাধিকার

কয়েকটি দেশের জন্মহার, মৃত্যুহার, গড় বয়স, জনঘনত্ব দেওয়া হল ঃ

জন্মের হার

[জন্মের হার = কোন দেশে সারা বছরে মোট জন্ম / বছরের মধ্যভাগে মোট জনসংখ্যা x ১০০০]

দেশ	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৪.২	১৪.২	১৪.১	১৪.১৪	১৪.১৩	১৪.১৪	১৪.১৪	১৪.১৬	১৪.১৮	১৩.৮২
বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র	১১.৭৬	১১.৫৪	১১.৩৪	১০.৯৯	১০.৮৮	১০.৭৮	১০.৭১	১০.৬৭	১০.৬৫	১০.৬৫
জাপান	৯.৯৬	১০.০৪	১০.০৩	৯.৬১	৯.৫৬	৯.৪৭	৯.৩৭	৮.১	৭.৮৭	৭.৬৪
জার্মানী	৯.৩৫	৯.১৬	৮.৯৯	৮.৬	৮.৪৫	৮.৩৩	৮.২৫	৮.২	৮.১৮	৮.১৮
ভারত	২৪.৭৯	২৪.২৮	২৩.৭৯	২৩.২৮	২২.২৮	২২.৩২	২২.০১	২২.৬৯	২২.২২	২১.৭৬
পাকিস্তান	৩২.১১	৩১.২১	৩০.৪	২৯.৫৯	৩১.২২	৩০.৪২	২৯.৭৪	২৭.৫২	২৮.৩৫	২৭.৬২
বাংলাদেশ	২৫.৪৪	২৫.৩	২৫.১২	২৯.৯	৩০.০৩	৩০.০১	২৯.৮	২৯.৩৬	২৮.৮৬	২৪.৬৮
আর্জেন্টিনা	১৮.৫৯	১৮.৪১	১৮.২৩	১৭.৪৭	১৭.১৯	১৬.৯	১৬.৭৩	১৬.৫৩	১৮.১১	১৭.৯৪
মঙ্গোলিয়া	২১.৫৩	২১.৮	২১.৮	২১.৩৯	২১.৪৪	২১.৫২	২১.৫৯	২১.০৭	২১.০৯	২১.০৯
ইথিওপিয়া	৪৫.১৩	৪৪.৬৮	৪৪.৩১	৩৯.৮১	৩৯.২৩	৩৮.৬১	৩৭.৯৮	৩৭.৩৯	৪৩.৯৭	৪৩.৬৬

সি আই এ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক

সৃষ্টি করা। তাই পুত্র সন্তানের কামনা প্রায় সকলেই করে থাকেন। এই লক্ষ্য পূরণের জন্যও বহুক্ষেত্রে দুই এর অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন।

ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী অপরিণত মৃত্যু, জনসংখ্যা হ্রাস করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। গত শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু বিস্ফোরণ, ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মত বহু ঘটনায় যে পরিমাণ অকাল মৃত্যু ঘটেছে - তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি, তথাপি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ম্যালথাসের তত্ত্বের ভিত্তি সঠিক নয় একথা ব্যাখ্যা করা হলেও, যে বাস্তব অবস্থার চিত্রকে সামনে তুলে ধরে তিনি তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন তার কোন পরিবর্তন আজও হয় নি। তাই **ম্যালথাস-এর মৃত তত্ত্ব আজও জীবিত**।

কোন ঘটনার বস্তুগত কারণ নির্ণয় করতে না পারলে, তার আবসান ঘটানো যায় না। ম্যালথাস যে ঘটনার দায় জনসংখ্যার উপর চাপাতে চেয়েছিলেন – তার কারণ নিহিত আছে সমাজ অর্থনীতির মধ্যে। তাই গড় উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে গেলেও ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়, অপুষ্টিতে মারা যায় বহু লোক। অনাহার, অর্ধাহার, বেকারত্ব দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। ম্যালথাসের সময় থেকে আজ অব্দি যে উৎপাদন ব্যবস্থা লাগু আছে তার লক্ষ্য হল বাজার অর্থাৎ মুনাফা। আর বাজার হল ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন লোকেদের জন্য। শিল্পজাত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয় পণ্যের ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুপাতে। আবার অধিক জনসংখ্যা, সস্তা শ্রমের বাজার বজায় রাখে।

উৎপাদনের লক্ষ্যই উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা – অর্থাৎ সকলের জন্য উৎপাদন নয় - ঘোষণা করে। তাইতো খাদ্য বস্তু উৎপাদন মাথা পিছু দৈনিক পর্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অপুষ্টি, অনাহার, অর্ধাহার বজায় আছে - আর সরকারী গুদামে চাল-গম ইত্যাদি পচে যায়,জাহাজ ভর্তি গম সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। আর এই উৎপাদনের

মৃত্যু হার

[মৃত্যু হার = কোন দেশে সারা বছরে মোট মৃত্যু/বছরের মধ্যভাগে মোট জনসংখ্যা x ১০০০]

দেশ	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৮.৭	৮.৭	৮.৭	৮.৪৪	৮.৩৪	৮.২৫	৮.২৬	৮.২৬	৮.২৭	৮.৩৮
বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র	১০.৩৮	১০.৩৫	১০.৩০	১০.২১	১০.১৯	১০.১৮	১০.১৩	১০.০৯	১০.০৫	১০.০২
জাপান	৮.১৫	৮.৩৪	৮.৫৩	৮.৫৫	৮.৭৫	৮.৯৫	৯.১৬	৮.৯৬	৯.২৬	৯.৫৪
জার্মানী	১০.৪৯	১০.৪২	১০.৩৬	১০.৩৪	১০.৪৪	১০.৫৫	১০.৬২	১০.৭১	১০.৮০	১০.৯০
ভারত	৮.৮৮	৮.৭৪	৮.৬২	৮.৪৯	৮.৩৮	৮.২৮	৮.১৮	৬.৫৮	৬.৪	৬.২৩
পাকিস্তান	৯.৫১	৯.২৬	৯.০২	৮.৭৯	৮.৬৭	৮.৫৪	৮.২৩	৮.০০	৭.৮৫	৭.৬৮
বাংলাদেশ	৮.৭৩	৮.৬	৮.৪৭	৮.৬৩	৮.৫২	৮.৪০	৮.২৭	৮.১৩	৮.০	৯.২৩
আর্জেন্টিনা	৭.৫৯	৭.৫৮	৭.৫৭	৭.৫৮	৭.৫৭	৭.৫৬	৭.৫৫	৭.৫৫	৭.৪৩	৭.৪১
মঙ্গোলিয়া	৬.১৪	৭.১০	৭.০১	৭.১৮	৭.১০	৭.০৩	৬.৯৫	৬.২১	৬.১৬	৬.১২
ইথিওপিয়া	১৭.৬৩	১৭.৮৪	১৮.০৪	২০.১৭	২০.৩৬	১৫.০৬	১৪.৮৬	১৪.৬৭	১১.৮৩	১১.৫৫

সীমাবদ্ধতাই, উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করে। একদিকে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া এবং অন্যদিকে বাজার দখলের লড়াইয়ে জয়-পরাজয়, পণ্যের বাজারে বন্যা-খরার সৃষ্টি করে। ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধির নামই অতিউৎপাদন সংকট - যা সকলের চাহিদার তুলনায় নগণ্য। এরফলে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ, ছাঁটাই, ভি আর এস নিত্য দিনের ঘটনা। আর এই নিত্য দিনের ঘটনাই বাজারকে আরও সংকুচিত করে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধিটা বেকারত্ব, দারিদ্র, ক্ষুধার কারণ নয়, বরঞ্চ উৎপাদন ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হল বেকারত্ব, অনাহার, অর্ধাহার।

বিভিন্ন দেশের জনঘনত্ব

এনসাইক্লোপিডিয়া (২০০৯-২০১১)

দেশ	জনসংখ্যা	আয়তন (বর্গ কিমি.)	জনঘনত্ব (বর্গ কিমি.)
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩১,০৬,১০,০০০	৯৮,২৬,৬৭৫	৩২
বৃটিশ যুক্তরাষ্ট	৬,২০,৪১,৭০৮	২,৪৩,৬১০	২৫৫
জাপান	১২,৭৩,৮০,০০০	৩,৭৭,৮৭৩	৩৩৭
জার্মানি	৮,১৭,৫৭,৬০০	৩,৫৭,০২২	২২৯
ভারত	১১৯,২৫,৭০,০০০	৩২,৮৭,২৪০	৩৬৩
পাকিস্তান	১৭,১৫,৪০,০০০	৮,০৩,৯৪০	২১৩
বাংলাদেশ	১৬,২২,২১,০০০	১,৪৩,৯৯৮	১,১২৭
আর্জেন্টিনা	৪,০০,৯১,৩৫৯	২৭,৮০,৪০০	১৪
মঙ্গোলিয়া	২৬,৭১,০০০	১৫,৬৪,১১৬	১.৭
ইথিওপিয়া	৭,৯২,২১,০০০	১১,০৪,৩০০	৭২

রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত গড় আয়ু
(২০০৫-২০১০)

দেশ	গড় আয়ু (বছর)
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৭৮.৩০
বৃটিশ যুক্ত রাষ্ট্র	৭৯.৪০
জাপান	৮২.৬০
জার্মানি	৭৯.৪০
ভারত	৬৪.৭০
বাংলাদেশ	৬৪.১০
আর্জেন্টিনা	৭৫.৩০
মঙ্গোলিয়া	৬৬.৮০
ইথিওপিয়া	৫২.৯০
পাকিস্তান	৬৩.০০

সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি

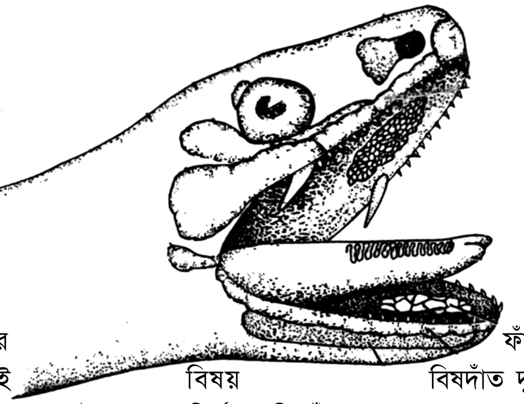

কোন বিষয় সম্পর্কে আতঙ্ক দূর করার বৈজ্ঞানিক পন্থা হল সেই বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই জ্ঞানকে নির্ভর করে পরিত্রাণের উপায় নির্ণয় করা। তাই সাপ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথা জানা দরকার।

আজ থেকে প্রায় ১০-১২ কোটি বছর পূর্বে ক্রিটেসিয়াস যুগে সাপের আবির্ভাব। সাপ সরীসৃপ-মেরুদন্ডী প্রাণী। এর মেরুদন্ড প্রায় ৬০০টি কসেরুকা দ্বারা গঠিত। চোয়াল অত্যন্ত নরম, জীভ চেরা - খাদ্য গিলে খায়। অধিকাংশ সাপের ফুসফুস একটা। তবে অজগর, ময়াল সাপের দুটো ফুসফুস। চোখের পাতা নেই, স্বচ্ছ আঁশের আবরণী থাকে - যাকে Brill বলা হয়। চোখ দুটি মুখের দুপাশে অবস্থিত থাকায় - দুচোখে একই বস্তু এক সঙ্গে দেখতে পায় না। দৃষ্টিশক্তি প্রখর নয়। কানে শোনার কোন উপায় নাই। কিন্তু বধিরতা সত্ত্বেও সাপ অত্যন্ত সুবেদী প্রাণী। শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অভাব পূরণ করে সাপের তীব্র ঘ্রাণ শক্তি। নাসিকা ছাড়াও জ্যাকবসন প্রত্যঙ্গ একাজে ব্যবহৃত হয়। বিপদের সময় বা শিকার ধরার সময়,চটপট জীভ বের করে জ্যাকবসন প্রত্যঙ্গের সাহায্যে লক্ষ্য বস্তুর অবস্থান দ্রুত অনুমান করে, সাপের মস্তিষ্ক অনুন্নত- স্মৃতি ধারণ করার ক্ষমতা এখনো অভিযোজিত হয়নি। তাই পূর্বে দেখা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে সাপের পক্ষে চেনা অসম্ভব। তাই প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ নেবার বিষয়টি ভিত্তিহীন। সাপের উপরের পাটিতে চারসারি ও নীচের পাটিতে দুই সারি দাঁত থাকে, নির্বিষ সাপের দাঁত শক্ত ও মজবুত। শিকার ধরার দাঁতগুলি খুব ধারাল। বিষদাঁত দুটি চোয়ালের বহিরে অবস্থিত। এছাড়া কিছু কিছু উপবিষদাঁতও আছে। দাঁতগুলি ভিতরের দিকে বাঁকানা। কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া, শঙ্কচূড়, শাখামুটি – প্রভৃতি বিষধর সাপের বিষদাঁত চোয়ালের সমানের দিকে থাকে। চন্দ্রবোড়া সাপের বিষদাঁত প্রকৃতপক্ষে ফাঁপা নল বিশেষ, মুখের দুপাশে বিষদাঁত দুটির দুপাশে আরো দুটি উঠতি বিষদাঁত থাকতে পারে। এদের বিষদাঁতগুলি বেশ বড় এবং গোটানো যায়। গোটানো অবস্থায় মুখের ভিতরে, "ভ্যাজাইনা ভেলটিস" নামক পর্দার ভেতরে থাকে। কামড়ানোর সময় ঐ দাঁত পর্দা থেকে বেরিয়ে আসে। কেউটে, গোখরো (Cobra)-দের বিষদাঁত ফাঁপা নলের মত নয়। বিষদাঁতের গা বরাবর একটা নলের মত আছে - যার মাধ্যমে বিষগ্রন্থি থেকে বিষ ক্ষত স্থানে পৌছায়। কেউটের কামড়ে একবারে বিষথলির থেকে ২/৩ অংশ বিষ বেরিয়ে আসে, কিন্তু চন্দ্রবোড়ার কামড়ে একবারে বিষথলির সবটুকু বিষ বেরিয়ে আসে।

সাপের বিষ থলির বিষ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেলে, প্রজাতি ভেদে মোটামুটি ১০-১২ দিনের মধ্যে তা আবার বিষে পূর্ণ হয়ে যায়। পুরুষ সাপের বিষের পরিমাণ স্ত্রী সাপের চেয়ে বেশি থাকে। সদ্যজাত কেউটে সাপেরও বিষ থাকে, ক্ষীণ বিষ সাপ যেমন - কালনাগিনী, লাউডগা, প্রভৃতির বিষদাঁত চোয়ালের পিছনের দিকে থাকে।

সাপ যৌন জনন প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার করে। সাপের জনন প্রক্রিয়াকে "শঙ্খ লাগা" বলা হয়। নির্দিষ্ট প্রজাতির পুরুষ সাপ ও মহিলা সাপের মধ্যে শঙ্খ লাগে। সাপ সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণী হলেও সকল প্রজাতির সাপ ডিম পাড়ে না। যেমন বিষধর চন্দ্রবোড়া, ফুরসা সাপ, ক্ষীণবিষ লাউডগা, নির্বিষ মেটলি ও তুতুর সাপ ডিম না পেড়ে সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে যে, পুঁয়ে সাপের (তেলেসাপ বা কেচোঁ সাপ) সকলেই স্ত্রী লিঙ্গ, এদের কোন পুরুষ হয় না। এরা পার্থেনোজেনেসিস (অপুংজনি) পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে।

সাপের অধিকাংশ প্রজাতি নির্বিষ। শিকার ধরার সময় সাপ বিষদাঁত ব্যবহার করে না। আত্মরক্ষার জন্যই বিষদাঁত

দিয়ে কামড় দেয়। বিষধর সাপও বিষহীন কামড় দেয় - যাকে ড্রাই বাইট বলে। প্রজাতি ভিত্তিক নির্বিষ কামড়ের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

ক্রিটিসিয়াস যুগ থেকে মধ্য টার্সিয়ারি (মায়োসিন) যুগ পর্যন্ত, অধিকাংশ সাপ, শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য গোপন জায়গায় লুকিয়ে থাকত এবং আতঙ্কিত শত্রুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে মেরে ফেলত। কিন্তু পৃথিবীতে যখন বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে তৃণভূমির আবির্ভাব হয় তখন কিন্তু পরিবারের (ফ্যামিলী) সাপ ছোট আকারে অভিযোজিত হল এবং তৎপর হল। ফলে আত্মরক্ষা করাও ভীষণ কঠিন কাজ হয়ে পড়ল। এই সমস্যা দূর করতে সাপের প্যারটিভ গ্রন্থি নিঃসৃত রস বিষে রূপান্তরিত হয়, যার ৯০% প্রোটিন এবং বেশ কিছু পরিমাণ এনজাইম। এনজাইমগুলি বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। ২০টার মতন এনজাইম মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই ক্ষতিকারক এনজাইমগুলি এবং প্রোটিনের এর এক বিশেষ মিশ্রণ-ই সাপের আত্মরক্ষার অস্ত্র। এই বিষ, সাপের চোখের পিছনের দিকে অ্যাভিওলি (Aveoli) নামক থলিতে সঞ্চিত থাকে এবং সাপ ইচ্ছা অনুযায়ী বিষ দাঁতের মাধ্যমে তা প্রয়োগ করতে পারে।

বিষ এর উপস্থিতি অনুযায়ী সাপের শ্রেণী বিভাগ ঃ

সাপ

তীব্রবিষধর সাপ	ক্ষীণবিষধর সাপ	নির্বিষ সাপ
ইলাপিডি	ডাইপারিডি	হাইড্রোপিডি
(কেউটে, গোখরো, কালাচ, শঙ্খচূড়, শাখামুটে)	(চন্দ্রবোড়া, ফুরসা, পাহাড়িচিতি)	(সকল সামুদ্রিক সাপ)

সাপের বিষের কয়েকটি রাসায়নিক উপাদান ঃ

(১) ফসফোডায়াসটারেস (Phosphodiesterases) – হৃদযন্ত্রকে আক্রমণ করে।

(২) কোলিনেসটারেস (Cholinesterase) – পেশী নিয়ন্ত্রণকে ব্যাহত করে।

(৩) হায়ালুরনিডেইস (Hyaluronidase) – কলাকোষের কেদ্যতা বৃদ্ধি করে। সাপের বিষকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায় –

(ক) হোমোটক্সিক ভেনাম – (Hemotoxic Venoms) – যা রক্ত সংবহনতন্ত্রকে আক্রমণ করে - যার ফলে হার্ট ফেল করে, রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়।

(খ) নিউরোটক্সিক ভেনাম – (Neurotoxic Venoms) – যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ককে আক্রমণ করে - যার ফলে শ্বাসযন্ত্র ও হৃদযন্ত্রের কার্য ব্যাহত হয়।

(গ) সাইটোটক্সিক ভেনাম (Cytotonic Venoms) – যা ক্ষতস্থানের কোষ ধ্বংস করে। রক্তবাহ নালীর কোষগুলো ধ্বংস হয়।

(ঘ) মাইটোটক্সিক ভেনাম (Myotoxic Venoms) – যা মাংসপেশীর পচন ঘটায়। বৃক্ক-এর কার্য ব্যাহত করে।

পূর্বে ধারণা ছিল একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির সাপের বিষ একটি মাত্র গ্রুপের – অর্থাৎ হয় হেমাটোটক্সিক বা নিউরোটক্সিক – এই ভুল ধারণা এখনো অনেক ক্ষেত্রে বজায় আছে। বর্তমানে পরীক্ষা দ্বারা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে একটি সাপের বিষের মধ্যে সাইটোটক্সিন, হেমোটক্সিন, নিউরোটক্সিন, সায়োটক্সিন একই সঙ্গে উপস্থিত থাকে – কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিষ বেশি বা কম।

সাপের কামড়ের ফলাফলগুলি নির্ভর করে ঃ

(১) নির্দিষ্ট সাপটির প্রজাতি

(২) সাপের কামড়টিতে বিষদাঁত ব্যবহার হয়েছে কিনা

(৩) শরীরের কোন অংশে কামড় দিয়েছে

(৪) সাপটি কতটা বিষ ঢালতে পেরেছে

(৫) আক্রান্ত ব্যক্তির শারিরীক প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মানসিক জোর
(৬) সাপটি স্ত্রী না পুরুষ
(৭) সাপের কামড়ের কতক্ষণের মধ্যে চিকিৎসা শুরু করা হল

সাপের কামড়ের সাধারণ অনুভূতি হল ভয়, আতঙ্ক, আবেগ প্রবণতা – যা আটোনোমাস নার্ভতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একজন পরিণত, সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাপের বিষের মারণমাত্রা – সাপের প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন, যেমন –

সাপের নাম	**বিষের মারণমাত্রা**
(১) কেউটে, গোখরো	১৫ মিগ্রা.
(২) কালাচ	১ মিগ্রা.
(৩) শঙ্খচূড়	১২ মিগ্রা.
(৪) চন্দ্রবোড়া	৪২ মিগ্রা.
(৫) শাখামুটি	১০ মিগ্রা’
(৬) পাহাড়ি চিতি	১০০ মিগ্রা.
(৭) ফুরমা	৫ মিগ্রা.

সাপের কামড়ের ক্ষতস্থান দেখে নির্ধারণ করা যায় যে এটি বিষধর সাপের নাকি নির্বিষ সাপের কামড়। যেহেতু বিষদাঁতের দৈর্ঘ্য, সাধারণ দাঁতের দৈর্ঘ্যের তুলনায় বেশি, তাই বিষধর সাপে কামড়লে দুটি গভীর ক্ষত [বিশেষ ক্ষেত্রে একটি] দেখা যাবে। নির্বিষ সাপের কামড়ের সৃষ্ট ক্ষত চিকিৎসা না করলে অনেক ক্ষেত্রে ইনফেকশন হতে পারে। নির্বিষ সাপের কামড়ে ভয়ে হার্ট ফেল করে মারা যাওয়ার ঘটনাও প্রচুর।

সাপ উত্তেজিত হলে, ভয় পেলে, পালাতে না পারলে - কামড়ায়। বাস্তবে শুধুমাত্র চোখে দেখে জীবন্ত সাপের প্রজাতি নির্ধারণ করা খুব কঠিন কাজ। মাত্র কয়েকটি বিষধর সাপের ফণা আছে। যেমন কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড়। কিন্তু কালাচ, চন্দ্রবোড়া এর মত মারাত্মক সাপের ফণা নেই।

সাপের কামড় ও তা থেকে মৃত্যুর হার ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন। আন্টার্টিকা ব্যতিত সকল মহাদেশেই বিষধর সাপ আছে। অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার কম। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সর্প ভয় ও সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার এতটাই বেশি যে, যা সাধারণের স্বাস্থ্য সমস্যা রূপে পরিগণিত হয়। কৃষি প্রধান গ্রামাঞ্চল – সাপ বসবাসের উপযুক্ত এবং সাপের খাদ্যের প্রাচুর্য্য থাকায় - পৃথিবীজুড়ে গ্রামাঞ্চলে কৃষির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই বেশি সাপের কামড় খায়। আবার আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুযোগ ব্যাপকভাবে না পৌঁছানোর কারণে সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ভারতে প্রায় ২৫০ প্রজাতির সাপের মধ্যে মাত্র ৪০টি প্রজাতির সাপ বিষধর। পরিবার বা গণের বিচারে মাত্র ৪টি পরিবারের সাপ মারাত্মক বিষ ধারণ করে। সারা বিশ্বজুড়ে (সামুদ্রিক সাপ বাদে) ৩০০০ প্রজাতির সাপের মধ্যে মাত্র ১৫% প্রজাতির সাপ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। সকল সামুদ্রিক সাপই বিষধর। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে বেশকিছু প্রজাতির সাপ পাওয়া যায়। কিন্তু অ্যাটলান্টিক মহাসাগর ও লোহিত সাগরে কোন কোন সাপ পাওয়া যায় না। মৎসজীবীরা জালে আটকে যাওয়া সামুদ্রিক সাপ, জাল থেকে ছাড়ানোর সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাপের কামড় খায়। যদিও সামুদ্রিক সাপ মারাত্মক বিষধর, তথাপি নথিভুক্ত কামড়ের ৮০% বিষহীন কামড়। যেহেতু সাপের কামড় লিপিবদ্ধ করা সরকারীভাবে বা আন্তর্জাতিক ভাবে বাধ্যতামূলক নয়, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাপের কামড় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা থেকে মৃত্যুও লিপিবদ্ধ (বিশেষ করে শিশুদের) হয় না। সুতরাং সারা বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর কত জনকে সাপে কামড়ায় তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব

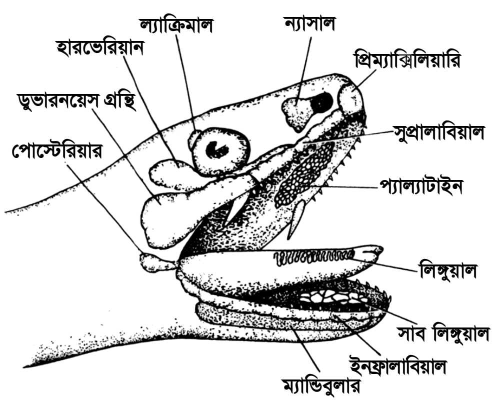

নয়। সরকারী হাসপাতালে যে কটি সাপের কাটা রোগী আসে তার একটা হিসাব পাওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া দুটি ভিন্ন পরিসংখ্যান দিয়েছে - তা তুলে ধরা হল।

(১) প্রতি বছর সারা বিশ্ব ৫.৪ মিলিয়ন মানুষ সাপের কামড় খায় যার মধ্যে ২.৩ মিলিয়ন বিষধর সাপের কামড়। আনুমানিক ১,২৫,০০০ জন মারা যায়।

(২) প্রতি বছর ১.২ - ৫.৫ মিলিয়ন মানুষ সাপের কামড় খায়, যার মধ্যে ০.৪২১ - ১.৮ মিলিয়ন বিষধর সাপের কামড় এবং ২০,০০০ - ৯৪,০০০ জন মারা যায়।

বিষধর সাপের আনুপাত ও বাস্তবে সাপে কাটা রোগীর সংখ্যার বিচারে এটা স্পষ্ট যে সাপে কাটা রোগীদের অধিকাংশই নির্বিষ সাপে কাটা। পুরানো সমাজ ব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী সাপে কাটা রোগীকে ওঝা ও গুণিদের কাছে নিয়ে যাওয়া হত। অনেক ক্ষেত্রে রোগীও সুস্থ হত। সাপের বিষ নিয়ে গবেষণা ও অ্যান্টিভেনাম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জানা গেছে যে সাপে কাটা রোগী, ওঝা বা গুণিনের কাছে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা সেই সব ক্ষেত্রগুলিতে থাকে সেসব ক্ষেত্রগুলিতে (১) সাপটি নির্বিষ বা ক্ষীণবিষ হয়। (২) বিষধর সাপের কামড়টি ড্রাই বাইট হয়। একটু খোঁজ খবর নিলেই জানা যায় যে, অধিকাংশ ওঝা বা সাপুরে সাপের কামড়েই মারা যায়। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ওঝা বা গুণিনরা বুঝতে পারে যে বিষধর সাপে কেটেছে নাকি নির্বিষ সাপে কেটেছে। চেন্নাই (মাদ্রাজ) ও মুম্বাই (বোম্বে)-এর সর্প গবেষণা কেন্দ্রে দেশজ গাছ-গাছড়া নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় - এমন কোন গুণ বা বৈশিষ্ট পাওয়া যায়নি যার দ্বারা সর্পবিষ নিষ্ক্রিয় করা যায়। সর্পবিষ নিষ্ক্রিয় করার একমাত্র উপায় যথাসময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মতন অ্যান্টিভেনাম ইনজেকশন প্রয়োগ এবং সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসকের চিকিৎসার অধীন থাকা।

অ্যান্টিভেনাম আবিষ্কারের পূর্বে, সারা বিশ্বজুড়ে বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যু অনিবার্য ছিল। সাপের কামড়ের তাৎক্ষণিক চিকিৎসার নানাবিধ পদ্ধতি থাকলেও, অ্যান্টিভেনাম ইনজেকশন-ই, একমাত্র সাপের বিষের বিষক্রিয়া বন্ধ করতে কার্যকরী। ফরাসী চিকিৎসক অ্যালবার্ট ক্যালমেইট (Albert Calmette), ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম, ভারতীয় কেউটে সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিভেনাম আবিষ্কার করেন। সাপের বিষের সামান্য পরিমাণ, ঘোড়া বা ভেড়ার শরীরে প্রবেশ (inject) করালে, এদের শরীরে বিষের প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডি গঠিত হয় – ঐ অ্যান্টিবডি পশুর

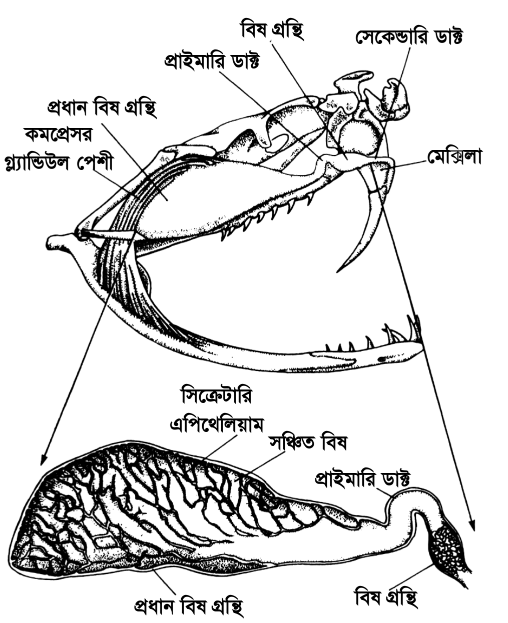

শরীর থেকে সংগ্রহ করা হয় – যা হল অ্যান্টিভেনাম। এই অ্যান্টিভেনাম বিষধর সাপে কাটা রোগীর শরীরে শিরার মধ্যে inject করা হয় - যা সাপের বিষের এনজাইমগুলির সহিত যুক্ত হয় এবং তাকে প্রশমিত করে। অ্যান্টিভেনাম প্রয়োগের পূর্বে রোগীর যা ক্ষতি সাধন হয় তা সারানো সম্ভব হয় না, তাই রোগীকে বাঁচাতে ও সুস্থ করতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অ্যান্টিভেনাম চিকিৎসা শুরু করা দরকার। আধুনিক অ্যান্টিভেনাম প্রকৃতপক্ষে পলিভ্যালেন্ট - যা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রজাতির বিষধর সাপের কামড়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

মৃত সাপ থেকেও সাবধানে থাকা প্রয়োজন। সাপের সদ্য ছিন্ন মস্তকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া অব্যাহত থাকে, ফলে কামড়াতে পারে। এই কামড় জীবিত সাপের কামড় অপেক্ষা কোন অংশে কম ক্ষতিকারক নয়। তাছাড়া মৃত সাপ হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় বিষদাঁত হাতে ফুঁটে বিষক্রিয়া হতে পারে। মৃত সাপের বিষদাঁত খালি হাতে না ধরে, ফরসেপ দিয়ে ধরা উচিৎ।

সাপ খাদ্যের সন্ধানেই গৃহস্থের ঘরের এলাকায় চলে আসে। তাই সাপের খাদ্য - ব্যাঙ, টিকটিকি, ইঁদুর-এগুলি ঘর থেকে তাড়ানো দরকার। সাপ তাড়ানোর জন্য যে কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় - তা প্রকৃত পক্ষে ফেনল হওয়ায়, অধিকাংশ সাপের ঘ্রাণেন্দ্রিয়তে তা এমনকোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না যাতে সাপ পালিয়ে যাবে। সাপ তাড়ানোর জন্য

ব্লিচিং পাউডার অনেক বেশি কার্যকরী।

অস্ট্রেলিয়ায় সবেচেয়ে বেশি বিষধর সাপের প্রজাতি আছে। এক সময় অস্ট্রেলিয়ায় বছরে মৃত্যুর সংখ্যার ৬০% সাপের কামড়ে ঘটত। বর্তমানে, অ্যান্টিভেনাম চিকিৎসার দৌলতে সাপের কামড়ে মৃত্যু ঐ দেশে নগণ্য হয়ে গেছে।

যদিও ইউরোপে জনসংখ্যা প্রায় ৭৩১ মিলিয়ন (৭৩ কোটি ১ লক্ষ) তথাপি বছরে সাপের কামড়ে মারা যায় মাত্র ৩০ জন। এর কারণ ইউরোপে স্বাস্থ্য সচেতন কর্মসূচী ও অ্যান্টিভেনাম চিকিৎসার প্রসার এবং বিষধর সাপের প্রজাতিও কম।

WHO-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে প্রতি বছর - প্রতি এক লক্ষ জনে ৬৬-১৬৩ জন সাপের কামড় খায়, যার মধ্যে ১৪-৬৮ জন রোগগ্রস্থ হয় এবং ১.১-২.৪ জন মারা যায়। বর্তমানে ভারতে জনসংখ্যা প্রায় ১২০ কোটি, বছরে সাপের কামড়ে মারা যাওয়ার নিম্নসীমা ১৩,২০০ জন এবং উর্দ্ধসীমা ২৮,৮০০ জন।

অ্যান্টিভেনাম আবিষ্কারএর পরেও, আমাদের দেশে সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তরে পন্ডিত ব্যক্তিগণ (শিক্ষিত সম্প্রদায়) বলে থাকেন - অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার-এর মূল কারণ। অর্থাৎ সাপে কাটা রোগীকে ওঝা, গুনিন-এর কাছে ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা সুস্থ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মানুষ কি শুধুই কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে ওঝা-গুনিন কাছে যায়, নাকি বিপদের সময় প্রতিকারের জন্য সহজলভ্য ওঝা-গুণিনের কাছে হাজির হয়। পূর্বেই আমরা জেনেছি যে, বিষধর সাপে কাটা রোগীকে অ্যান্টিভেনাম চিকিৎসা দ্বারা বাঁচান ও সুস্থ করা সম্ভব, যদি দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায়। এই চিকিৎসা বাড়ীতে থেকে করা সম্ভব নয় - কারণ রোগীকে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করতে হয়। তাই হাসপাতালে ভর্তি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের মতন দেশে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বত্র নেই। অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্য যে সময় ব্যয় হয় - তাতে বিষক্রিয়ায় রোগীকে বাঁচানোর পর্যায় অতিক্রম করে যায়। আমাদের দেশে অধিকাংশ গ্রাম-এ হেল্‌থ সেন্টার নাই, কোথাও কোথাও হেল্‌থ সেন্টার আছে তো ডাক্তার নাই, ডাক্তার আছে তো অ্যান্টিভেনাম নাই।

ঝাড়-ফুঁক-মন্ত্র-তন্ত্র যেমন কিনতে হয়, অ্যান্টিভেনাম ও তেমনি কিনতে হয়। **দুটি, দুই সমাজ ব্যবস্থার পণ্য**। ঝাড়-ফুঁক-এর খরচ থেকে অ্যান্টিভেনাম-এর খরচ অনেক বেশি। মানুষ তার প্রিয়জনকে বাঁচানোর জন্য ঘটি-বাটি (ভিটে-মাটি) বেঁচে অর্থ জোগাড় করে। কিন্তু বিষধর সাপের কামড়ে বিষক্রিয়া, ভিটে-মাটি বেঁচে টাকা জোগাড় করার সময়টা দেয় না। যাদের বেঁচার মতন কিছুই নাই - তাদের কাছে অ্যান্টিভেনাম-এর আবিষ্কার নিরর্থক। যদি প্রতিগ্রামে হেল্‌থ সেন্টারের মাধ্যমে অ্যান্টিভেনাম রাখার ও সাপে কাটা রোগীকে চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা যায় - অর্থাৎ অ্যান্টিভেনাম চিকিৎসা যদি সকলের কাছে সহজ লভ্য হয় - তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় আমাদের দেশে সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার দ্রুত হ্রাস পাবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা একমাত্র দেশের সরকারের পক্ষেই করা সম্ভব। সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তা হল ইকলজিক্যাল ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বিষধর সাপ না মারার নির্দেশ এবং সাপের কামড়ে কেউ মারা গেলে তার পরিবারকে এককালীন কিছু টাকা আনুদান দেওয়া। রাজ্যভেদে তা ১০,০০০-১০০,০০০ টাকা।■

সমীক্ষণ পড়ুন ও পড়ান

নিয়মিত রচনা, চিঠি, রিপোর্ট পাঠিয়ে
সমীক্ষণ-এর নিয়মিত প্রকাশে সাহায্য করুন।

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী ৪৭, বিবেকানন্দ সরণী, পূর্ব বড়িশা, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮